নিষাদী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

B·P

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী—১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ দাস
৩৭/৬, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
জহর দাস

মুদ্রাকর :
যশোদা মাইতি,
লিপি মুদ্রণ,
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

স্বনামধন্য সহৃদয় চিকিৎসক

সুব্রত সেন কে—

চুরুলন ভাল্লমখানা কায়েলের জল কেটে দক্ষিণ থেকে উত্তর মুখে এগিয়ে চলেছিল। হাল ধরে বসেছিল সাহির। ভাল্লমের পেছনে পালকির মতো ছোট্ট একখানা ঘর। তার ভেতর বসে ক্ষুদে জানালাটি খুলে সন্ধ্যার নেমে আসা দেখছিল আঁখি।

অদূরে সমুদ্রতীর। সন্ধ্যার গন্ধ পেয়ে ঝাঁক বেঁধে তেরামালা পাখিরা ঢেউভাঙা বালির জমিন ছেড়ে উড়ে আসছিল সারি সারি নারকেল বাগান লক্ষ্য করে। ওদের ডানায় তখনও লেগে আছে সন্ধ্যার আবীর।

কায়েল বা ব্যাকওয়াটারের দুই কূল জুড়ে সবুজ নারকেলের বাগান। মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল টালির ছাউনিওয়ালা কোনা-উঁচু দু' একখানা কুডিল। উঁচু-নিচু পাহাড়ী জায়গার জন্য কুটির-গুলো বড় ছাড়া ছাড়া। ত্রিবান্দ্রমের দক্ষিণ সমতলে কিংবা পাল-ঘাটের দিকে যে ঘন বসতি দেখা যায় তা এখানে নেই।

ছায়া নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তীরের গাছপালার রঙ মুছে গেল। অন্ধকার চাপ চাপ হয়ে থমকে দাঁড়াল নারকেলবীথির ভেতর।

মাঝে মাঝে ঝলকে উঠছে দু'একটা আলোর রশ্মি। ভিলাক্কু অর্থাৎ প্রদীপ জ্বলছে কুটিরের সামনে, তারই ছটা।

কোথাও বা গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে আলোর উজ্জ্বল ফুলকির মতো নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসছে ঝাঁক ঝাঁক পুত্তরি বা জোনাকি।

আঁখি জানালা বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়াল।

সাহির ওকে দেখে বলল, এখন নৌকো বাঁধি ?

তোমার নৌকো, তুমি কাণ্ডারী, সুতরাং বাঁধা-ছাড়ার নিয়ম, ক্ষণ তোমারই হাতে। এখানে আমার কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই।

সে কি ! তোমার ইচ্ছাতেই তো কায়েলের জলে নৌকো ভাসালাম।

আঁখির বুক জুড়ে খুশীর ঝলক। সে দুষ্টুমি করে বলল, আমি নাও ভাসাতে বলেছি, কিন্তু তরী বাঁধার কথা তো বলিনি।

সাহির কায়েলের জলে তরঙ্গ তুলে হাসল।

হাসলে যে ?

তোমার কথা শুনে।

কি রকম ?

আলোর সঙ্গে অন্ধকার, সুখের সঙ্গে দুঃখ, চলার সঙ্গে থামা যে চিরকালের নিয়মে বাঁধা সেটা তুমি জান না বলে।

আঁখি বলল, আমি ভেবেছিলাম, অষ্টমুদি লেকে প্রতি বছর যে যুবা পুরুষটি বোট রেসে ফার্স্ট প্রাইজ ছিনিয়ে আনে, স্নেক বোট রেসে যার দল ফি বছর নেহরু ট্রফি জিতে নেয়, সে কোনোদিন থামতে জানে না।

সাহির বলল, তোমার দু'দুটো কমপ্লিমেন্টের জন্য ধন্যবাদ।

এবার সাহিরের কাছে এগিয়ে এলো আঁখি। ওর মাথার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলল, তুমি আমাকে সত্যিই কি এতখানি নিষ্ঠুর ভাবলে ?

সাহির বলল, না, তোমাকে নিষ্ঠুর ভাবিনি, তবে সপ্তদশী, অষ্টাদশীরা বেশ কিছুটা খেয়ালী হয় ; তাই ভেবেছিলাম।

আঁখি মুহূর্তে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, তোমাকে একটি সুন্দর জিনিস উপহার দেবে তোমার বান্ধবী।

কি দেবে দাও।

ডান হাতখানা পাতল সাহির।

না না, হাত পেতে এ উপহার নেওয়া যায় না। আচ্ছা, তোমার বন্ধুর নামটা একবার উচ্চারণ কর তো দেখি ?

কেন, আঁখি।

আমি তোমার আঁখি ভরে উপহার দিতে চাই। তার আগে এই বাঁ দিকের ডাঙায় তোমার ভাল্লমখানা নোঙর কর।

তাই করল সাহির।

এবার পেছন ফিরে বাঁয়ে তাকাও।

আশ্চর্য ! রুপোর থালার মতো বনের মাথায় জেগে উঠেছে চাঁদটা। পূর্ণিমার চাঁদ।

কিছুক্ষণ দুজনেই অম্লান চাঁদটিকে উপভোগ করল।

সাহির বলল, সত্যি অমূল্য উপহার।

আঁখি বলল, এখন তুমি আমাকে কি উপহার দেবে বল।

আঁখি হাত পাতল।

না, তোমার হাতে তুলে দেবার মতো উপহার আমার সঞ্চয়ে নেই। তবে তুমি যদি তোমার দুটো চোখ বন্ধ করে এই নারকেল গাছের তলায় কিছুক্ষণ বসে থাক তাহলে আমি তোমাকে সামান্য একটি উপহার দিতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নারকেল গাছের তলায় পাথুরে ঢিবির ওপর বসে চোখ বন্ধ করল আঁখি।

ধীরে ধীরে কোথা থেকে ভেসে এলো সন্ধ্যার একটা সকরুণ রাগিণী। মনে হলো, বেহালার সূক্ষ্ম টানে সুরগুলো চাঁদের কিরণে ব্যথার ঢেউ তুলে চরাচরে ছড়িয়ে পড়ছে।

সাহির আঁখির আড়ালে একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রাগিণী 'ললিতা'র আলাপ করে চলেছে তার বেহালায়।

দক্ষিণীদের মতে সায়ংকালে ললিতা রাগিণীটি সাধলে নাকি মহতী লক্ষ্মীলাভ হয়। তাছাড়া আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র, আর সেই চন্দ্র থেকেই তো উৎপন্ন এই ললিতা।

ছড়ের টানে কি অপরূপ মূর্তিটি ফুটে উঠছে ললিতার।

আপন মনে বেহালার ছড় টানছে সাহির। সুর ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে রূপ ধরে। সাহির যখন বেহালা বাজায় তখন সে আত্মমগ্ন হয়ে যায়।

সুরের পথ ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মূর্তি। জ্যোৎস্নার জলে স্নান সেরে নিয়েছে গৌরবর্ণা সুলোচনা যুবতী। বিলাসিনীর বেশে সেজেছে সে। গলায় তার দুলছে সপ্তচ্ছদের মালা। অপরূপা ললিতা, তবু বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছে একটা সকরুণ দীর্ঘশ্বাস।

কতক্ষণ পরে বাজনা থামল সাহিরের। ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মূর্তি। হলুদ জম্বরে বুক ঢাকা। সোনালী জরির পাড় দেওয়া ধবধবে সাদা পুডাবাতে শরীর জড়ানো। গলায় দোসূতী মুক্তার মালা। কেশগুচ্ছ বামে চূড়াবদ্ধ।

গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল সাহির। কিন্তু নিঃশব্দে কখন তার সুর কায়া

ধরে একেবারে পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে জানতেই পারেনি।

আঁখি ওকে এখন জড়িয়ে ধরেছে। তার চোখে টলটল করছে জল।

তুমি ক্রাচ মাটিতে ফেলে শুধু গাছে হেলান দিয়ে বেহালা বাজাচ্ছ!

মৃদু হাসি সাহিরের মুখে, এখনও ডান পায়ে ভর দিয়ে আমি এক ঘণ্টার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

ক্রাচ দুটো মাটি থেকে তুলে নিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিল আঁখি।

সাহির বলল, আমার ছোট্ট উপহারটুকু তোমার পছন্দ হয়েছে?

আগে বল, তুমি যেখানে যখন বাজাবে তখন বসে বাজাবে?

কথা দিলাম, এ ভুল আর কোনোদিন হবে না।

এবার আঁখি বলল, পাঁচ বছর ধরে তোমার বাজনা আমাদের কলামণ্ডপে শুনে আসছি। আমার নাচের সঙ্গে তুমি কত অনুষ্ঠানে না সংগত করেছ, বেহালা বাজিয়েছ, সরগম করেছ, কিন্তু আজ এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটুকু সব দিনের ভাল লাগাকে ছাপিয়ে গেছে।

এতে পরিবেশের দান আছে আঁখি। জ্যোৎস্নার প্লাবন, ঝলকে ঝলকে বয়ে আসা সমুদ্রের হাওয়া, নারিকেল পাতার কাঁপন, কায়েলের বয়ে চলা, সব মিলে আমার ভেতরের শিল্পীটাকে জাগিয়ে তুলেছে।

ওরা এসে উঠে বসল ভাল্লমে।

সাহির বলল, সবে সন্ধ্যে নেমেছে, চাঁদ জ্বলজ্বল করছে আকাশে, এখুনি রাতের মতো নোঙর না করে চল আরও খানিকটা এগিয়ে যাই। পাঁচ কিলোমিটার মতো দূরত্বে একটা স্রোত কায়েল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ওখানে আজ রাতে নোঙর করা যাবে। ইচ্ছে হলে নির্জন সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াতে পার।

তাহলে তো খুব ভাল হয়, কিন্তু তোমার কষ্টের কথা ভেবে আমার আর একটুও নড়তে ইচ্ছে নেই।

তুমি গান গাও, সেই যে 'খর বায়ু বয় বেগে', আর আমি দাঁড় টানি, তাহলে বিনা কষ্টে পৌঁছে যাব।

আঁখি অমনি বলল, ওটা তো মেঘলা দিনের গান। এমন চাঁদের আলোয় ওটা কি গাওয়া যায়!

আমি তোমার সুরটা শুনে দাঁড় বাইব, কথার মানে নাইবা বুঝলাম। দারুণ রিদম্ আছে গানটায়।

গান ধরল আঁখি। সাহির দাঁড়ে বসে তালে তালে উড়িয়ে নিয়ে চলল ভাল্লম।

দূর থেকে সোঁ সোঁ একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কাছাকাছি হতেই জলকল্লোলটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সমুদ্রে ঢুকছে কায়েলের জল। মুখের কাছে ঘোরাফেরা করছে কয়েকটা লণ্ঠন।

ওখানে কি হচ্ছে সাহির?

পূর্ণিমার ভরা কোটালে জেলেরা মাছ ধরায় মেতেছে। ওখানে সমুদ্র আর কায়েল বড় কাছাকাছি, এই তোমার আমার দোস্তির মতো।

দারুণ মুডে আছ মনে হচ্ছে?

তুমি কি আমাদের বন্ধুত্বকে অস্বীকার করতে পার?

আঁখি কেমন ইমোশনাল হয়ে পড়ল। সে আবেগভাঙা গলায় বলল, পাঁচ বছর একটা মেয়ে ঘরমুখো হয়নি, কেবল চারবার সে তার মাকে দেখেছে। কিসের টানে এতগুলো বছর সে এই কেরালায় পড়ে আছে বলতে পার? তোমাদের মতো কয়েকজন বন্ধু, আণ্টি আঙ্কেলের ভালবাসার টানে।

একখানা হাত তুলল সাহির। মুখে বলল, ক্ষমা করে দাও।

মুখোমুখি বসেছিল আঁখি। উঠে দাঁড়িয়ে সাহিরের মাথার চুল এলোমেলো করে দিল। পছন্দসই কথা না হলে চুলে হাত চালানোর একটা অভ্যেস আছে আঁখির।

সাহির বলল, চুলে হাত দাও কিছু বলব না, কিন্তু দয়া করে এক ডজন চিরুনি কিনে দিও।

দেশে বিদেয় করে দিচ্ছ, ভয় নেই, আর কেউ তোমার চুলে ধরে নাড়া দেবে না।

এবার গলাটা ভারী হয়ে উঠল সাহিরের।

দেশ থেকে সত্যিই কি তুমি আর কলামণ্ডপে ফিরবে না?

সব কিছু নির্ভর করছে মায়ের ওপর সাহির। কেবল মেয়েকে

দেখতে মা চারবার কেরালা এসেছে কিন্তু আমার নাচ শেখায় বিঘ্ন ঘটবে বলে মা একবারও আমাকে দেশে নিয়ে যায়নি। এবার জরুরী তলব। নিজে আসতে পারবে না, মেয়েকে যেতে হবে।

কিছু উদ্দেশ্য আছে হয়তো।

থাকলেও আমার অজানা। মাসে দু'খানা চিঠি আসে মায়ের কাছ থেকে। প্রাণের উত্তাপে ভরা, কিন্তু অখণ্ড মনঃসংযোগে সাধনার কথা লেখা থাকে প্রতি চিঠিতে।

সাহির বলল, তুমি যদি অভয় দাও, একটা কথা তোমার কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে করে।

নির্ভয়ে বল।

আচ্ছা, সারা দেশের ছেলেমেয়েরা যখন অ্যাকাডেমিক কোয়ালি-ফিকেশান বাড়াবার জন্য স্কুল-কলেজে ছুটছে তখন তুমি ওদিক থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে আছ কেন?

আমার বাবা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিলেন। অতি অল্প বয়সে ইউনিভারসিটির লেকচারার হয়ে কাজ শুরু করেন। কিন্তু ঐ পুঁথি-পড়া বিদ্যায় হঠাৎ তাঁর বিতৃষ্ণা আসে। তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে আপন মনে পড়াশোনায় মেতে রইলেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে নানান ধরনের বই পড়তেন। তারপর বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে তাঁর লেখা শুরু হলো। পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে লাগল। গুণীজনের প্রশংসা পেলেন। কিন্তু লেখক হিসেবে পূর্ণ বিকশিত হবার সুযোগ পেলেন না। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সেই মারা গেলেন।

তুমি তখন কত বড় হয়েছ?

সাত বছরে পা দিয়েছি। ছোট থেকেই আমি আপন মনে নাচতাম। কোনো স্টেজে নাচের পারফরমেন্স হলে আমার চোখ নর্তকীর ওপর আঠার মতো লেগে থাকত। বাড়ি ফিরে এসে নাওয়া-খাওয়া ভুলে নাচতাম।

স্কুলে যেতে না?

আমার কাছে স্কুলে যাওয়াটা বিভীষিকায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বইয়ের ব্যাগ বইতে বইতে বেঁকে গিয়েছিল কাঁধ। পড়া আর পরীক্ষার চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। রোজ কাঁদতাম। খেলাধুলোর সময় নেই, পড়া আর পড়া। আকাশ হারিয়ে গিয়েছিল, সবুজ

মুছে গিয়েছিল। আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু মা চেপে পড়াতে বসাতো। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে মায়ের প্রায়ই কথা কাটা-কাটি হতো। বাবা বলত, স্কুল নয়, জল্লাদখানা, শিশুপাল বধ হচ্ছে।

বাবার হঠাৎ করে চলে যাবার পর মা একেবারে বদলে গেল। স্কুল ছাড়িয়ে নাচের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলে। বাড়িতে সব রকম পড়ার ব্যবস্থা ছিল। সে পড়া পড়া খেলা বলতে পার। টিচার আসতেন, যতক্ষণ খুশি পড়তাম, তারপর ইচ্ছে না হলে বই তুলে রেখে দিতাম।

সাহির জানতে চাইল, এই ব্যবস্থায় তোমার মা খুশী ছিলেন ?

না হলে এখানে নাচ শিখতে পাঠাবে কেন ! তাছাড়া এখানেও তো আমি অবসর সময়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলাম। নিয়মিত পাঠ নিচ্ছিলাম ইংরাজী আর ইতিহাসের দুজন টিউটরের কাছ থেকে।

তাই ! এটা আমার অজানা ছিল আঁখি।

শুধু তোমার নয় সাহির, কলামণ্ডপের প্রায় কেউই একথা জানে না। মা শিবন আঙ্কেলের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল।

একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে আঁখি।

বল।

তোমরা নিশ্চয়ই সম্পন্ন অবস্থার মানুষ ?

সম্পন্ন অবস্থা বলতে যদি বিত্তবানের কোঠায় ফেল তাহলে ভুল করবে। আমার দাদু কিছু সঞ্চয় রেখে গেছেন। তাছাড়া মা একটা গার্লস্ স্কুলের হেডমিস্ট্রেস।

তোমার মা তোমার বাবার পথ ধরেননি তাহলে।

মা খুবই প্র্যাকটিকাল। তবে আমার খেয়ালি বাবার ওপর মায়ের অগাধ ভালবাসা ছিল।

সাহির বলল, তোমার বাবা চলে যাবার পর তোমার মা তোমাকে নিজের কাছে রেখে পড়ালেন না কেন ?

বাবার ওপর গভীর ভালবাসা আর দুর্বলতার জন্য। মা তার মেয়েকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাই স্কুল-

কলেজের বাঁধাধরা শিক্ষার ভেতর না রেখে কলামণ্ডপে মা আমাকে ভর্তি করে দিয়ে যায়।

আচ্ছা আঁখি, তোমার মা কি শিবন আঙ্কেলকে আগে থেকে চিনতেন?

একেবারেই না।

তবে, তুমি এখানে এলে কি করে?

আমার বাবার বন্ধু ছিলেন সুবল আঙ্কেল। সুবলসখা চৌধুরী।

আঁখির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সাহির বলল, সুরকার সুবলসখা? যিনি বাংলাদেশ থেকে এসে শিবন সাহেবের প্রায় প্রতিটি ডকুমেন্টারিতে সুর দিতেন? সুপারহিট সব সুর!

তা আমি আগে জানতাম না, পরে জেনেছি। বাবার চলে যাবার পরে ছ'সাত বছর কেটে গেল। সুবল আঙ্কেল মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতেন। আমি তখন নাচ শিখতাম 'কলাপী'তে। উনি একদিন আমাদের বাড়িতে এসে আড়াল থেকে আমার নাচ দেখলেন। আমি তখন আপন মনে কত্থক প্র্যাকটিস করছিলাম। পরে মায়ের সঙ্গে সুবল আঙ্কেলের কিছু পরামর্শ হয়ে থাকবে। একদিন মা আর আঙ্কেলের সঙ্গে ট্রেনে উঠে বসলাম। তারপর এসে পৌঁছলাম শিবন আঙ্কেলের কলামণ্ডপে।

সাহির বলল, তোমাকে প্রথম আমি যেদিন দেখেছি সেদিন তুমি দু'হাতে চোখের জল মুছছিলে। মা আর সুবল আঙ্কেলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তুমি ফিরছিলে সরিতা আন্টি আর শিবন সাহেবের সঙ্গে। ওঁরা তোমাকে পিঠে হাত বুলিয়ে নানা কথায় ভোলাচ্ছিলেন।

সে সময় সরিতা আন্টি আমার জন্য যা করেছেন তা কখনই ভুলব না। নাচ শেখানো, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, এমনকি মা চলে যাবার পর কয়েক মাস আমাকে রাতে বুকের ভেতরে আগলে নিয়ে শুতেন।

আমরা সে সময় তোমাকে দূর থেকে আসতে দেখলেই বলতাম, ঐ যে সরিতা আন্টির 'নয়নমণি' আসছেন।

সাহিরের কথায় হেসে ফেলল আঁখি। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে

গেল। একটা ব্যথার স্বর ফুটে উঠল গলায়, আজ সকালে তোমার ভাল্লমে তুলে দেবার সময় আমাকে জড়িয়ে সরিতা মায়ের কান্না দেখলে তো। উনি আমার আন্টি নন, সত্যিকারের মা।

সাহির বলল, শিবন সাহেব এমনি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলেন যে তোমার মাথায় শুধু হাত রেখে দিয়েছিলেন, কথা বলতে পারেননি। শেষে আমাকে বলেছিলেন, ওর অনেকদিনের শখ ভাল্লমে চেপে কায়েলটা ঘুরে বেড়ানোর, তুমি কিছু পথ ঘুরে ওকে নিয়ে বাসে এর্নাকুলম চলে যাবে, রাতের ট্রেনে ওকে তুলে দেবে হাওড়ার গাড়িতে।

আমাকে তখন সরিতা মা জড়িয়ে ধরেছিলেন, আমি আঙ্কেলের কথাগুলো শুনতে পাইনি। আচ্ছা সাহির, তুমি ঠিক সময়ে কলামণ্ডপে ফিরতে না পারলে আঙ্কেল কিছু ভেবে বসবেন না তো?

সে পথ আমি বেঁধে রেখেছি। ওঁর সঙ্গে কথা আছে, তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি কোচিনে কয়েকদিন মামার কাছে থেকে আসব।

আঁখি বলল, এতখানি পথ যাব, রিজার্ভেশান কি সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে?

সাহির বলল, সে ভাবনা দয়া করে তোমার কাণ্ডারীর ওপর ছেড়ে দাও। শিবন সাহেব কি সাধে তোমাকে আমার সঙ্গে ছেড়েছেন!

আঁখি বলল, আমি বায়না ধরেছিলাম, দেশে ফেরার আগে একবার কায়েলে ঘুরব।

শুধু ওটাই কারণ নয়।

তবে?

এর্নাকুলমের স্টেশান মাস্টার আমার ছোট মামা। আর তাঁর কাছে গিয়ে পড়লে একটা হিল্লে হয়ে যাবে। শিবন সাহেব একাধিক বার আমাকে দিয়ে একাজ করিয়েছেন। তাই ভরসা করে তাঁর মূল্যবান রত্নটিকে তুলে দিয়েছেন আমার জিম্মায়।

এই প্রথম তোমার মুখ থেকে শুনলাম, রত্ন হিসেবে আমি ফ্যালনা নয়।

সাহির দাঁড় থেকে হাত তুলে নিয়ে বলল, সত্যিই কি তুমি নিজের সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন ?

নাচের ভেতর ডুবে থাকতে আমার ভাল লাগে সাহির, আমি আর কিছু বুঝি না।

সাহির বলল, নাচের কম্পিটিশানগুলো থেকে যখন প্রাইজ ছিনিয়ে আন তখন ভাল লাগে না ?

হাতে পেয়ে আনন্দ হয়, কিন্তু পরে দুঃখ পাই।

দুঃখ পাও ! কেন ?

তুমি কি বিশ্বাস করবে আমার কথা ?

এ কী বলছ, তোমাকে অবিশ্বাস করার কথা ওঠে কি করে ?

প্রাইজ পাওয়ার দিন রাতে বিছানায় শুয়ে আমি কাঁদতাম।

কাঁদতে ! কেন ?

দুটো কারণে।

যেমন ?

বাবার কথা মনে পড়ত। বাবা থাকলে তাঁর আনন্দ সব থেকে বেশি হতো। তিনি দেখে যেতে পারেননি, তাই আমার কান্না।

এটা স্বাভাবিক। আর তোমার দ্বিতীয় কারণ ?

যারা প্রাইজ পেল না, তাদের কষ্টের কথা ভেবে কাঁদতাম।

তোমার মন সত্যি ভীষণ নরম।

এবার জোরে দাঁড় টেনে কায়েলের মোহনা পেরিয়ে গেল সাহির।

আঁখি বলল, নৌকো বাঁধবে কোথায় ?

সাহির বলল, আর যেখানে হোক, জেলেদের ঐ ভিড়ের ভেতর নয়।

তালে তালে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ উঠছে দাঁড়ে। ঝকঝকে আয়নার কুচিগুলো ঝলসে উঠছে জলে।

মোহনা থেকে খানিক দূরে এসেই দাঁড় থেকে হাত তুলে নিল সাহির। এবার পেছনে গিয়ে হালটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাল্লম এসে ভিড়ল একটা বালির ঢিবির গায়ে। ছোট-বড় কয়েকটা বনঝাউয়ের সংসার। গদাম গদাম আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ছে জোয়ারের ঢেউ। কায়েলের ডানদিকে নারকেল

বাগানে চাঁদের কিরণ-উৎসব চলেছে। জ্যোৎস্নার রুপোলী পরাগ উড়ছে চরাচরে। তলোয়ারের মতো নারকেলের লম্বা পাতাগুলো সমুদ্র থেকে উঠে আসা হাওয়ার ঝাপটায় শব্দ করে নড়ে উঠছে। চাঁদের আলোয় তলোয়ারের সেকী ঝলকানি!

ওরা নৌকোখানা নোঙর করে বালির ঢিবি পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে চলতে লাগল।

সাহির বলল, এসো, আমরা বনঝাউয়ের আড়ালে নিজেদের গোপন করে বসি।

আঁখি সাহিরের হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, একটা রুপোর থালার মতো চাঁদ, কি বিপুল তার টান দেখেছ! আস্ত আরব সাগরটাকে আথালপাথাল করে দিচ্ছে। চল, আগে ঐ নীল সমুদ্রটাকে ছুঁয়ে আসি।

ক্রাচে ভর দিয়ে জলরেখার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সাহির। পুডাবা খানা বাঁ হাতে সামলে ধরে ঢেউ ভাঙতে লাগল আঁখি।

কতক্ষণ পরে ওরা ফিরে এলো বনঝাউয়ের তলায়। বসল পাশাপাশি বালির ওপর।

আঁখি বলল, তুমি বাজাও আমি শুনি। এই মুহূর্তে আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

সাহির তার ঝোলা ব্যাগ থেকে বেহালাখানা বের করতে গিয়ে তাকাল আঁখির দিকে।

মনে হচ্ছে আমরা অন্য কোনো একটা গ্রহে রয়েছি, যেখানে আমাদের চারদিকটা আশ্চর্যরকম মায়াময়। আলোয় তেজ নেই, কিন্তু অপূর্ব উজ্জ্বলতায় ভরে আছে চরাচর।

সাহির বলল, আজ এই বালুর জমিনে তুমি নাচবে আর আমি বাজাব। ভাববো, আমরা ভিন্ন গ্রহেরই মানুষ।

হঠাৎ আঁখির একটা খেয়াল চেপে বসল, নাচব, কিন্তু তুমি আগে একটা গল্প শোনাও সাহির, যেমন নাচের শেষে কলামণ্ডপে শোনাতে।

সাহির বলল, নাচ কিন্তু শুরু হয়নি এখনও। আমি নাচের শেষে আরব্য রজনী থেকে গল্প শোনাতাম, সেটা ছিল আমার দিক থেকে তোমাদের নাচের উপহার।

আঁখি বলল, তা ঠিক, তবে সে দিনগুলো ছিল নিয়মে বাঁধা। আর আজ আমরা ভেসে চলেছি অনিয়মের স্রোতে। সুতরাং নাচের শেষে না হয়ে আগেই শুরু হতে পারে গল্প।

আজ দেখছি তোমাকে গল্পে পেয়ে বসেছে। ঠিক আছে, তবে গল্প দিয়েই শুরু হোক আজকের শুভ সন্ধ্যাটা। কিন্তু এ গল্প আরব্য রজনীর নয়, খুব বেশি পুরনো হলে পোর্তুগীজ আমলের।

তাহলে তো সত্যিকারের গল্প।

গল্প, গল্প, এর সত্যি-মিথ্যে জানিনে।

সাহির শুরু করল, তখন পূর্ব আর পশ্চিমের সঙ্গে কেরালার মশলা-ব্যবসা জমে উঠেছে। পূর্বে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে চীন পর্যন্ত কেরালার মশলার কদর। হিন্দু ব্যবসাদাররা পূর্ব দিকে এই ব্যবসাটা চালালেও পশ্চিমের ব্যবসা চালাত পশ্চিম এশিয়া আর ইউরোপের বণিকরা। কেরালাতে ঘাঁটি ছিল তাদের।

এই পশ্চিমের ব্যবসা নিয়ে প্রতিযোগিতা ছিল মুসলমান আর খ্রীস্টান ব্যবসায়ীদের ভেতর। উত্তর আফ্রিকার মুসলমান মুরেরা পোর্তুগীজদের সঙ্গে এই মসলা-ব্যবসা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। প্রায়ই জলপথে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। আবার মাঝখান থেকে জলদস্যুরা লুঠতরাজ চালাতো সুযোগ বুঝে।

কেরালার রাজা-মহারাজাদের ভেতরেও কিছুটা দ্বন্দ্ব ছিল। একজন পোর্তুগীজদের সুবিধা দিতে চাইলে অন্যজন তাকে উৎখাতের চেষ্টা করত।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় পোর্তুগীজ শক্তি সবাইকে হটিয়ে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। তাদের কামান আর অস্ত্রশস্ত্র অন্যদের তুলনায় বেশ উন্নত ধরনের ছিল।

ওরা কোচিনে একটা দুর্গ তৈরি করে বেশ প্রতিপত্তির সঙ্গে ব্যবসা চালাতে লাগল। কোচিনের রাজা ছিল ওদেরই বলে বলিয়ান। মূল ভূখণ্ডের জামোরিনরা জানত, পোর্তুগীজদের দুর্ভেদ্য দুর্গটি অধিকার করতে পারলে কোচিনের রাজা হবে তাদের পদানত।

জামোরিনরা মুরদের, এমনকি জলদস্যুদেরও সাহায্য চাইল।

তাছাড়া গুজরাটের সুলতান, পারস্য, তুরস্ক, আরব, ইজিপ্টের শাসনকর্তাদের কাছ থেকে জলযুদ্ধের জন্য সৈন্য ও হাতিয়ার চেয়ে পাঠাল।

সে সময় কোচিনে প্রবেশ করার দুটো পথ ছিল। পালতোলা জাহাজ নিয়ে ঢুকতে চাইলে কায়েল বা ব্যাকওয়াটারের জল সমুদ্রের জোয়ারে ফুলে-ফেঁপে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আবার পদাতিকদের কোচিনে ঢুকতে হলে ভাটার টানে সংলগ্ন কায়েলের জল একটা বিশেষ জায়গা থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে।

এই ভাটার সময়ে পদাতিকরা কায়েল পার হয়ে গেলেই দুর্গদ্বারের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হতো।

এবার শোন আসল কাহিনী। মূল ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মনাভ মন্দির। সেই মন্দির থেকে অল্পদূরে বিশাল নারকেল-বীথি। আর ঐ সুদৃশ্য বাগানের ভেতরেই দেবরতিয়াল কুঞ্জকুট্টির অতি মনোহর কুটির। যুবতী দেবদাসী একটি বিশ্বস্ত পরিচারিকার সঙ্গে ঐ কুটিরে বাস করে। সন্ধ্যায় ফুলের সাজে সজ্জিত হয়ে সে তার প্রিয় পরিচারিকার সঙ্গে নিভৃত বনপথ ধরে মন্দিরে উপস্থিত হয়। সন্ধ্যারতি দেখে অন্তরালবর্তী গবাক্ষ থেকে। পুরোহিত অক্ষম হয়ে পড়ায় তাঁর পুত্র নারায়ণন দেব পূজার ভার নিয়েছেন। অতি সুদর্শন যুবাপুরুষ। স্বল্পবাসে তাঁর গৌরবর্ণ ও নিটোল স্বাস্থ্যের মাধুর্য যেন উপচে পড়ে। যুবতী কুঞ্জকুট্টি তন্ময় হয়ে দেখে নবীন পুরোহিতের অপরূপ আরতি-মহিমা!

এক সময় আরতিপর্ব শেষ হয়। ফুল, ধূপ আর চন্দনের মিলিত গন্ধে ভরে ওঠে মন্দির ও তার সংলগ্ন নাটমণ্ডপ।

এরপর আনত চোখে, ধীর চরণ ফেলে নাটমণ্ডপে এগিয়ে আসে নর্তকী কুঞ্জকুট্টি। পদ্মনাভকে প্রণাম করে শুরু হয় তার প্রতিদিনের নৃত্য। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত দেবরতিয়াল। দেবতাকে প্রতি রজনীতে সে উপহার দেয় তার অনিন্দ্যসুন্দর নৃত্য।

তার নৃত্যের দর্শক পুরোহিত নারায়ণন। কোনো কোনো রজনীতে বিশেষ অনুষ্ঠানে নির্বাচিত পারিষদদের নিয়ে রাজা উপস্থিত থাকেন নাটমণ্ডপে।

রাজা নৃত্যগীত ও বাদ্যের অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

তিনি কুঞ্জকুট্টির নাচে মুগ্ধ হয়ে কখনো মুক্তামালা, কখনো বা হিরকাঙ্গুরীয় উপহার দেন।

হঠাৎ আঁখি বলে উঠল, এমন রাজার সামনে নাচতে পারলে ধন্য হয়ে যেতাম। মূল্যবান সব উপহার জুটতো।

সাহির অমনি বলল, জন্মাতে হয় দেবদাসী কুঞ্জকুটির মতো ভাগ্য করে।

আঁখি সকৌতুক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে সৌভাগ্য আর এ জন্মে হলো না।

এবার বলতে পার কাহিনীর মোড় কোনদিকে ঘুরবে?

আঁখি বলল, তুমি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ গল্পের রথ, তাই তুমিই জান কোনপথে চলবে রথের চাকা।

তবু, একটা কিছু অনুমান?

আঁখি একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, মনে হচ্ছে নর্তকী কুঞ্জকুট্টি তরুণ পুরোহিতের প্রেমমুগ্ধ।

সাহির বলল, তোমার অনুমান সত্য। তবে পুরোহিত নারায়ণনের মনেও রঙ লেগেছিল। দুই প্রেমিকের ভেতর দূতিয়ালি করেছিল, কুঞ্জকুট্টির পরিচারিকা।

আঁখি বলল, তারপর?

প্রায় প্রতি রজনীতে তরুণ পুরোহিত আসতেন নর্তকীর কুঞ্জকুটিরে। গল্পে, গানে, ভালবাসায় তখন উভয়েই প্রমত্ত। এমনকি প্রেমে মগ্ন দুই প্রেমিক দূরে কোথাও চলে গিয়ে নীড় বাঁধারও স্বপ্ন দেখতে লাগল।

এদিকে রাজা তখন মধ্য যৌবনে দীপ্তিমান। তাঁর লালসার দৃষ্টি পড়েছিল যুবতী পরমাসুন্দরী নর্তকীটির ওপর। তিনিও মাঝে মাঝে নর্তকীর নির্জন কুটিরে গিয়ে তাঁর সকাম ভালবাসার কথা জানাতেন।

কুঞ্জকুট্টি রাজার বিরাগভাজন হতে চাইত না। সে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সহাস্যে বলত, মহারাজের অবিদিত নেই যে দেবরতিয়াল একমাত্র দেবতার চরণেই নিবেদিত। তার ওপর অধিকার শুধুমাত্র প্রভু পদ্মনাভের।

রাজা দেবভক্ত, তাই কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু লালসা ভয়কে উপেক্ষা করে একসময় সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে।

তখন নর্তকী শেষ প্রতিরোধ হিসেবে রাজাকে বলে, এই ধর্মস্থানে কোনোরকম ব্যভিচার সহ্য করবেন না দেবতা। সুতরাং আপনি আমাকে মন্দির থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চলুন, অথবা আপনার প্রাসাদে অন্তঃপুরিকার মর্যাদায় রেখে দিন।

দেবতা, প্রজাসাধারণ ও মহারানীদের কোপে পড়ার ভয়ে মহারাজ কুঞ্জকুট্টির ব্যাপারে আর অধিকদূর অগ্রসর হলেন না। তবে কামনার আগুন নিভল না। মনের গভীর গুহায় ধিক্‌ধিক্ করে জ্বলতে লাগল।

এখানে এসে সাহির একটু থামল। অমনি কৌতূহলী আঁখি প্রশ্ন করে বসল, এ সমস্যার সমাধান হলো কি করে?

সে এক আকস্মিক বিপর্যয়ে!

আঁখি বিস্মিত, বিপর্যয়! কি রকম?

দুজনের কামনার ধনকে মাঝখান থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল এক তীক্ষ্ণ নখরওয়ালা বাজ।

আঁখি সবিস্ময়ে বলল, ঐ ভয়ংকর বাজটি কি শমন দেবতা?

সাহির মাথা নেড়ে বলল, তোমার অনুমান সত্য হলে সমস্যার সুষ্ঠু একটা সমাধান হয়ে যেত, কিন্তু বাজের মূর্তি ধরে যে এলো সে কোনো দেবতা নয়, এক ভয়ংকর দস্যু।

দস্যু!

হ্যাঁ, পোর্তুগীজ দস্যু। কোচিনের সুরক্ষিত দুর্গের রক্ষক লরেন্‌জো।

আঁখি সাহিরের গা ঘেঁষে বসে বলল, তোমার গল্প দেখছি দারুণ এক মোড় নিল। বল, বল, বাজটা কেমনভাবে ছোঁ মারল?

তুমি যে দেখছি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলে।

আঁখি এবার সাহিরের একখানা হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ঘটনাটা নিশ্চয়ই রোমাঞ্চকর, তাই আগে থেকে প্রোটেকশান নিচ্ছি!

আশ্রয় চাইছ একজন পঙ্গুর কাছে?

আঁখি সাহিরের কথায় দুঃখ পেয়ে অভিমানে দূরে সরে বসল।

কি হলো, সরে গেলে যে ?

আমার কোনো বন্ধু অন্ধ, পঙ্গু, একথা আমি ভাবতেই পারি না। তাই এই মুহূর্তে তোমাকে অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

আঁখির সেন্টিমেন্টটা মুহূর্তে বুঝে নিল সাহির। সে হাত বাড়িয়ে আঁখিকে কাছে টেনে নিল।

মুখে বলল, এই পাঁচ বছর তোমার সঙ্গে কলামণ্ডপে বাজিয়ে আমি যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। পৃথিবী যে এত সবুজ, এমন নীল আর এতখানি সোনালী তা আগে কখনও এমন করে চোখে পড়েনি।

আঁখি বলল, এখন আমরা গল্পে ফিরে যাই সাহির। তারপর শুরু হবে তোমার বাজনা।

সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাচও। এখন গল্পের শেষ অংশটা শোন।

কোচিন দুর্গের রক্ষক লরেন্‌জো তার সুদৃশ্য একটি ভাল্লমে চেপে প্রায়ই কেরালার ব্যাকওয়াটারে ঘুরে বেড়াতো। এমন একদিন ভ্রমণের সময় লরেন্‌জো এক নারকেলবীথির ভেতর সদ্যস্নাতা একটি অতি সুদর্শনা মেয়েকে দেখতে পায়। সে তখন এলোচুল ছড়িয়ে সূর্যের তাপটুকু গায়ে মাখছিল। পাকা নাসপাতির মতো গায়ের রঙ। তার ওপর সূর্যের সোনালী আলো পড়ে যেন পিছলে যাচ্ছিল। পরনে নেরিয়দ। ঊর্ধ্ব অঙ্গের অনেকখানিই অনাবৃত। লীলাভরে হাতের পাতা দুটি রেখেছিল মাথার পেছনে। একটি পা ছুঁয়েছিল সামনে ফলন্ত সোনামুখি ডাবের গাছে। মেয়েটি চোখ বন্ধ করে গুনগুন আওয়াজ তুলে গান গাইছিল।

আঁখি বলল, দারুণ।

সাহির বলল, হ্যাঁ, দারুণ দেখতে মেয়েটি।

আমি বলতে চাইছি তোমার ছবি আঁকার ক্ষমতা দারুণ। তারপর কি হলো ?

লরেন্‌জো তখুনি মেয়েটিকে ভাল্লমে তুলে নিয়ে পালাতে চায়। কিন্তু মাল্লারা বাধা দিয়ে বলল, অল্পদূরে পদ্মনাভ মন্দির। এই নারিকেলবীথি মন্দিরেরই সম্পত্তি। মনে হচ্ছে মেয়েটি ঐ মন্দিরেরই দেবদাসী। দিনের আলোয় ওকে হরণ করতে গেলে ওর চিৎকার শুনে চারদিক থেকে ছুটে আসবে লোকজন।

লরেন্‌জোর মনে ধরল কথাটা। সে এক রাতে সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে এই নারিকেলবীথির তলায় হাজির হলো। শুক্লা তৃতীয়া তিথির চাঁদ তখন আকাশে। গাছের তলায় বিছানো ছায়াপথ দিয়ে স্বল্প চাঁদের আলোয় পথ চিনে ওরা প্রথমে এসে পৌঁছল দেবদাসীর কুটিরে। সেখানে ঘর শূন্য। ওরা ছুটল মন্দিরের দিকে।

কয়েকজনমাত্র রক্ষক ছিল পদ্মনাভ মন্দিরে। তারা দূর থেকে সশস্ত্র লোকদের ছুটে আসতে দেখে যে যেদিকে পারল প্রাণ বাঁচাতে পালাল।

মন্দিরের নাটমণ্ডপে তখন চলছিল নৃত্য। পুষ্পসজ্জায় সেজে কুঞ্জকুট্টি নাচছিল। দর্শক আসনে একাই বসেছিলেন তরুণ পুরোহিত নারায়ণন। নর্তকীর দৃষ্টিতে, করাঙ্গুলিতে আকুল আমন্ত্রণের মুদ্রা। সম্মোহিত নারায়ণন একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সেদিকে।

হঠাৎ তলোয়ারধারীরা ঘিরে ফেলল নাটমণ্ডপ। আতঙ্কে কেঁদে উঠল কুঞ্জকুট্টির পরিচারিকা। হতচকিত নারায়ণন পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন।

নর্তকী নির্ভীক গলায় বলল, কি চাও তোমরা?

মুখোশধারী দলপতি লরেন্‌জো সোজাসুজি উত্তর করল, কোচিনে পোর্তুগীজ দুর্গের নাচঘর তোমার নূপুরের ধ্বনি শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

কুঞ্জকুট্টি চারদিকের পরিস্থিতি একবার দেখে নিল।

নারায়ণনের বুকের কাছে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে ধারালো একখানা তলোয়ার। দলপতির ইঙ্গিত পেলেই সেটা ঢুকে যাবে বুকের মধ্যে। আতঙ্কগ্রস্ত পুরোহিতের চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

নর্তকী বলল, আমি যাবার জন্য তৈরি, কিন্তু মন্দিরে রক্তপাত করা চলবে না।

দলপতি লরেন্‌জোর ইশারায় পুরোহিতের বুকে ঠেকানো তলোয়ারখানা সরে গেল।

সেই রাতে পোর্তুগীজদের নৌকো পরিচারিকাসহ নর্তকীকে

উঠিয়ে নিয়ে জলপিপির মতো জল ছুঁতে ছুঁতে উড়ে চলে গেল, কোচিনের দুর্গ লক্ষ্য করে।

আঁখি বলল, এবার তাহলে শুরু হবে দুর্গ-রহস্য।

না, ঠিক রহস্য নয়। তবে কুঞ্জকুট্টির কালোপযোগী বাস্তব বোধবুদ্ধি ছিল। সে যখন দেখল, দুর্গ থেকে মুক্তিলাভ করা তার পক্ষে কোনোরকমেই সম্ভব নয় তখন সে লরেন্‌জোর অনুবর্তী হয়ে চলতে লাগল। কিন্তু অন্তর থেকে সে ভুলতে পারল না পুরোহিত নারায়ণনকে। তার মনে পড়ত, প্রতি রাতে মন্দিরদ্বার বন্ধ করে তার কুটিরে আসতেন সুদর্শন নবীন পুরোহিত। গৃহ-দ্বারে প্রবেশের আগে কুঞ্জকুট্টি তাঁর চরণ ধুইয়ে দিয়ে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিত। তারপর গৃহদ্বারে রাখা প্রদীপটি তুলে আরতি করত সে। এইভাবে ঘরের ভেতরে বরণ করে নিত তার প্রিয়তমকে।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে খুব কষ্ট হতো কুঞ্জকুট্টির। না জানি তাকে ছাড়া নারায়ণন কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

কুঞ্জকুট্টির কষ্টের সময় তার পাশে এসে দাঁড়াতো তার বিশ্বস্ত পরিচারিকাটি। সে সাধ্যমত প্রবোধ দেবার চেষ্টা করত তার মালিককে।

এমনি করে কোচিন দুর্গে লরেন্‌জোর আশ্রমে নর্তকীর কেটে গেল প্রায় একটি বছর।

এখন লরেন্‌জোর আশ্রিতা হিসেবে দুর্গবাসী সৈন্যেরা নর্তকীকে দেখে সম্ভ্রমের চোখে, তাকে যাতায়াতের পথে দেখা হলেই সম্মান জানায়।

কুঞ্জকুট্টি দুর্গের বাইরে যেতে পায় না, তবে দুর্গের গবাক্ষ দিয়ে দেখতে থাকে নীল সমুদ্রকে। দুর্গের পেছনে বড় বড় পাথরের স্তূপ। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তাল নীল সমুদ্রের ঢেউ। সাদা ফেনায় মল্লিকার উচ্ছ্বাস। মুক্ত তেরামালা পাখিরা উড়ছে ঢেউয়ের মাথায়। নুলিয়ারা সমুদ্র ছেঁকে রুপালী ফসল তুলে আনছে। অদূরে একটি পাহারাদার জলযান নোঙর করে রয়েছে। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে কয়েকটা লাল, সাদা পালতোলা নৌকো।

লরেন্‌জো সারাক্ষণ কোচিন দুর্গ আগলে থাকে না। সে

কোডাংগাল্লুর, কান্নানোরের পোর্তুগীজ দুর্গগুলোতেও যাতায়াত করে। খ্রিস্ট উৎসবগুলোর সময় সে প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন পোর্তুগীজ ঘাঁটিতে গিয়ে পাঁচ-সাতদিন ধরে হৈ-হুল্লোড় করে আসে।

কুঞ্জকুট্টিকে কিন্তু লরেন্‌জো কোথাও সঙ্গে নিয়ে যায় না। আসলে চার্চে গিয়ে এখনও তারা বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে নেয়নি।

কুঞ্জকুট্টির একান্ত অনুরোধেই এক বছরের জন্য সংযম রক্ষা করে আছে লরেন্‌জো। অবশ্য এর পেছনে একটা ভয়ও ওকে তাড়া করে ফিরেছে। ভয়টি ওর ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল নর্তকী কুঞ্জকুট্টি। সে বলেছিল, পুরো একবছর আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা চলবে না। আমি দেবদাসী, একবার বিয়ে হয়েছে আমার দেবতার সঙ্গে, এখন তোমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করলে দেবতার ক্রোধ আর অভিশাপ তোমার ওপর পড়বে। এর পরিণতি একমাত্র মৃত্যু। কিন্তু পুরো একটি বছর যদি আমি প্রার্থনার ভেতর দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করতে পারি তাহলে অবশ্যই তিনি আমাকে বর দিতে চাইবেন। তখন আমি আমাদের মিলনের বরই চেয়ে নেব।

খুবই বুদ্ধি করে দেহটাকে শুদ্ধ রাখার একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছিল নর্তকী। তার মনে আশা ছিল, দেবরাতিয়ালকে দুর্গ থেকে উদ্ধারের একটা চেষ্টা হবে মহারাজের দিক থেকে। এজন্যে এক বছরের প্রতীক্ষা যথেষ্ট। ভাগ্য প্রসন্ন না হলে পোর্তুগীজ দস্যুর হাতে অথবা সমুদ্রের বুকে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাকে।

এক বছর প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। নর্তকীকে ঘিরে ঘনিয়ে উঠেছে নিরাশার অন্ধকার। হঠাৎ প্রভু পদ্মনাভ শেষ একটা সুযোগ যেন ওর হাতে এনে দিলেন।

বড়দিনের উৎসবে যোগ দিতে লরেন্‌জো গিয়েছিল কোজি-কোডের চার্চে। ফিরে আসতে সপ্তাহের কিছু বেশি সময় লাগবে।

এদিকে দুর্গ ছেড়ে একদিনের জন্যেও কোচিন বাজারে নর্তকী কুঞ্জকুট্টি বের হয়নি। কিন্তু সে তার পরিচারিকাটিকে পাঠাতো নানারকম জিনিস কিনে আনার জন্য। লরেন্‌জো কিংবা দুর্গের অন্য কেউ এ কাজে বাধা দেবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করত না।

এই বাইরে যাবার সুযোগে এক মৎস্য-ব্যবসায়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

আলাপ করে ফেলল বুদ্ধিমতী পরিচারিকাটি।

আঁখি অমনি বলে উঠল, আমার মনে হচ্ছে এটাই হবে রাজার সঙ্গে দেবদাসীর একটা যোগসূত্র।

সাহির বলল, একেবারে অভ্রান্ত অনুমান তোমার। ঐ মৎস্যজীবীটি ছিল পদ্মনাভ মন্দিরের কিছুদূরে অবস্থিত এক ধীবর-পল্লীর বাসিন্দা।

আঁখি বলল, তারপর?

পরিচারিকাটি তার রূপে এবং কথায় ভুলিয়েছিল ধীবরটিকে। সে রাজার কাছে নর্তকী কুঞ্জকুট্টির খবর পৌঁছে দিতে লাগল।

নর্তকী ভাবল, এই তার মুক্তির শেষ সুযোগ।

ধীবরের মাধ্যমে খবর গেল, আগামী বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে প্রথম রাত্রিতে কোচিনবাসীরা পানভোজনে মত্ত থাকবে। দুর্গের রক্ষক লরেন্‌জো সপ্তাহকালের জন্য দুর্গ ছেড়ে অন্যত্র গেছে। আমি দুর্গরক্ষক সৈন্যদের পানভোজনে প্রমত্ত করে রাখব। ঠিক মধ্যরাত্রিতে খোলা থাকবে দুর্গদ্বার। সে সময় ভাটার টানে কায়েলের জল সরে গিয়ে চলার পথ খুলে দেবে। আপনি নিঃশব্দে, সসৈন্যে কায়েল পার হয়ে বিনা বাধায় দুর্গে প্রবেশ করতে পারবেন। আপনার পথপ্রদর্শক থাকবে আপনারই রাজ্যের অধিবাসী এই পত্রবাহক।

মহারাজ, আমার মতো এক সাম্যন্য নর্তকীকে উদ্ধারের জন্য নয়, বিদেশীর হাত থেকে দুর্গকে ছিনিয়ে নেবার জন্য এই হলো সুবর্ণ সুযোগ।

পত্র চলে গেল যথাস্থানে। নির্দিষ্ট দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল রাজার সৈন্যবাহিনী।

এদিকে লরেন্‌জোর স্থলাভিষিক্ত হলো নর্তকী কুঞ্জকুট্টি। সে দুর্গের প্রতিটি সৈন্যকে আমন্ত্রণ জানাল রাত্রির পানভোজনের জন্য।

ভোজ্য এবং পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাচঘরে কুঞ্জকুট্টি মোহিনী মূর্তিতে পরিবেশন করল মোহিনী আট্টম।

নাচ শেষে উল্লাসে ফেটে পড়ল নাচঘর।

এবার সুসজ্জিত বিশাল ভোজনগৃহে ভোজ্য-পানীয়ের বিপুল আয়োজন। নিজের হাতে পানীয় পরিবেশন করল নর্তকী কুঞ্জকুট্টি।

দুর্গাধিপের ভাবী পত্নীর হাতের পনীয়, এ যে বড় সম্মানের। এর আস্বাদই আলাদা। প্রহরীদের পান-ভোজনের দিকে নজর দেওয়া হলো বিশেষভাবে। কখনও পরিচারিকা, কখনও স্বয়ং কুঞ্জকুট্টি তাদের পানভোজনের তদারক করল।

পরিকল্পনা মাফিক সমাপ্ত হলো ভোজন-পর্ব। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল দুর্গরক্ষকেরা।

আঁখি বলল, তাদের খাবারে কি বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল?

না, না, কড়া ঘুমের ওষুধ মেশান হয়েছিল তাদের পানীয়ে। আর গাছগাছালি থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে এনেছিল পরিচারিকাটি।

আঁখি বলল, এরপর রাজা এসে নিশ্চয় দুর্গ দখল করলেন।

তা করলেন।

এবং মুক্ত করে নিয়ে গেলেন কুঞ্জকুট্টিকে।

সাহির বলল, মুক্ত হয়েও মুক্তি পেল না দেবরতিয়াল।

কি রকম!

তাকে পরিচারিকাসহ নিয়ে যাওয়া হলো তার নিজের রাজ্যে। সেখানে বিশ্বস্ত পরিচারিকার সঙ্গে সে রইল তার পুরাতন কুটিরে।

কিন্তু মন হয়ে উঠল অস্থির। নাটমণ্ডপে সান্ধ্য-নৃত্যের জন্য ডাক পড়ল না তার। প্রথম রজনীতে আকুল প্রতীক্ষার পথ বেয়ে এলো না কোনো প্রিয়জন। শেষে কষ্টের ভার অসহনীয় হওয়ায় সে এক রাত্রিতে তার প্রিয় দাসীটিকে পাঠাল প্রিয়তম পুরোহিত নারায়ণনের কাছে।

ফিরে না আসা পর্যন্ত অন্ত ছিল না উদ্বেগের। চাঁদের আলো, রাতের হাওয়া, পাতার মর্মর তার কাছে কোনোরকম আনন্দ বা সান্ত্বনা বয়ে আনছিল না।

অবশেষে দাসীটি ফিরে এল গভীর রাতে, কুঞ্জকুট্টির উদ্বেগের শেষ সীমায়। সে তখন প্রশ্ন করার মতো অবস্থাতেই ছিল না।

দাসীটি বলে চলল, পুরোহিত তো প্রথমে আমাকে চিনতেই পারেন না। মনে হলো, ভূত দেখছেন।

আমি বললাম, কি ঠাকুর, চিনতে পারছেন না?

কোনো কথা না বলে ভ্রূকুটি হেনে মন্দিরের ভেতর ঢুকে বসে

রইলেন। আমিও ছাড়ার পাত্রী নই, দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে। বোবার মুখ থেকে যতক্ষণ না কথা বেরুচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, আমি আছি কিনা। যখন বুঝলেন আমি পেছন ছাড়ছি না তখন প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, মন্দিরে কেন এসেছ তুমি ?

বললাম, আপনার খোঁজে।

মনে হলো, আকাশ থেকে পড়লেন। বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, আমি তো তোমাকে চিনি না।

আমি বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই বললাম, আমি কিন্তু আপনাকে খুব ভাল করেই চিনি। এই মন্দিরে আসার পর আরও ভালভাবে।

বেশ মেজাজ দেখিয়ে বললেন, কি বলতে চাও তুমি ?

আমিও ছেড়ে দেবার পাত্রী নই। বেশ চড়া গলায় উত্তর দিলাম, আমি যা বলতে চাই তা আপনি ভাল করেই জানেন।

এবার এদিক-ওদিক তাকালেন। আমি যদি বেফাঁস কিছু জোরে বলে ফেলি আর রক্ষীরা শুনতে পায় তাহলে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকবে না। তাই এবার গলা নামিয়ে বললেন, দেবদাসীকে বলো আমাকে রেহাই করে দিতে। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে পোর্তুগীজের রক্ষিতাকে ছুঁতে পারব না, তাহলে রৌরব নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। তাছাড়া মন্দিরের কাজ দেবার মালিক তো আমি নই। মহারাজের মর্জি হলে তিনিই কাজ দেবেন ডেকে।

আমার ঐ মানুষটার সামনে দাঁড়াতেও আর প্রবৃত্তি হলো না। কোনো কথা না বলে চলে এলাম।

নর্তকী কুঞ্জকুট্টি কোনো মন্তব্য করল না। সে উদাস চোখে কতক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক ঠেলে।

তার হয়তো মনে হচ্ছিল, এই মানুষটির কথা ভেবেই কী সে তার এই দেহটাকে এতদিন শুদ্ধ রেখেছে! প্রতি রজনীতে যার মুখের একটি কথা শোনার জন্য ঐ ব্রাহ্মণ সংগোপনে মন্দির থেকে চলে আসত, যার একটি করাঙ্গুলির স্পর্শ পাবার জনা অধীর হয়ে উঠত ব্রাহ্মণকুমার, সে কি সত্যিই এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে!

পরিচারিকাটি প্রবোধ দেওয়া সত্ত্বেও সারাটি রাত তার কাটল নিদ্রাহীন।

পরের দিন তাকে মুখোমুখি হতে হলো ভিন্ন এক পরিস্থিতির। আর সেখান থেকেই নির্ধারিত হয়ে গেল তার জীবনের পরিক্রমা।

আঁখি বলল, তোমার কাহিনী বেশ জমে উঠেছে।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল সাহিরের মুখে। বলল, অস্তগামী সূর্যেরও সমারোহ আছে।

এ কথা কেন ?

তাহলে শোন শেষের অংশটুকু।

পরের দিন রাজপ্রাসাদ থেকে ডাক এলো নর্তকীর। সংবাদ-বাহকের মুখ থেকে শোনা গেল, তাকে নাকি বহুমূল্য রত্ন আভরণ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

শিবিকা সঙ্গেই এনেছিল সংবাদবাহক। সেই শিবিকাতে বসে নর্তকী কুঞ্জকুট্টি চলে গেল রাজসভায়। মনে মনে তার একটি আকাঙ্ক্ষা সন্ধ্যার প্রদীপের মতো জ্বলে রইল। তাকে অবশ্যই মহারাজ দেবদাসীর পদে বহাল রাখবেন। আর তখন শুধু সে তার দেবতার উদ্দেশ্যেই নৃত্য নিবেদন করবে। কোনো উৎসুক চোখের দিকে কোনোদিনই আর তাকাবে না সে।

রাজসভা কানায় কানায় পূর্ণ। সভাসদদের নিয়ে আলো করে বসে আছেন মহারাজ।

শিবিকা থেকে নেমে দাঁড়াল নর্তকী। যুক্ত করে সভার উদ্দেশ্যে নিবেদন করল প্রণতি।

এবার রাজার পক্ষ থেকে এক সভাসদ দাঁড়িয়ে উঠে দেশের জন্য কুঞ্জকুট্টির অমূল্য অবদানের কথা বলে গেলেন।

বলা শেষ হলে সিংহাসন থেকে স্বয়ং মহারাজ উঠে দাঁড়ালেন। হাতে বহুমূল্য একখানি হিরকখচিত হার।

হারখানি কুঞ্জকুট্টির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, রাজ্যের পক্ষ থেকে তোমার অসামান্য কাজের জন্য এই পুরস্কার।

নর্তকী হারটি মাথায় ছুঁইয়ে কণ্ঠে ধারণ করল।

এবার মহারাজ বললেন, আর একটি ঘোষণা রয়েছে।

নর্তকীর সমস্ত ইন্দ্রিয় ঘোষণাটি শোনার জন্য উন্মুখ। তার

আকাঙ্ক্ষা এতক্ষণে তাহলে পূর্ণ হতে চলেছে।

মহারাজ বললেন, পদ্মনাভ মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমরা সকলেই অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই মন্দিরে এতকাল নানা ধরনের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য আমরা দেবদাসী নিয়োগ করতে পারিনি। বর্তমানে পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ায় নতুন দেবদাসী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামীকাল পুণ্য তিথিতে মন্দিরের নাটমণ্ডপে সেই দেবদাসী তার নৃত্যলীলা দেখাবে দেব পদ্মনাভকে।

সবাই মহারাজের ঘোষণায় সাধুবাদ দিতে লাগলেন।

এবার মহারাজ সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, আমরা কিন্তু নর্তকী কুঞ্জকুট্টিকে অনাদর করতে পারি না। তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতকাল বন্দী থাকতে হয়েছিল শত্রু-দুর্গে। সুতরাং তার প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য আছে।

থামলেন মহারাজ।

দেবদাসী কুঞ্জকুট্টি নিজের সমর্থনে একটিও কথা বলল না। সে যে এতখানি প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর কিভাবে নিজেকে পবিত্র রেখেছে সে কথা একবারও উচ্চারণ করল না। কে বিশ্বাস করবে তার কথা! তাছাড়া এই সভায় নিজের পক্ষে কিছু বলা আত্মসম্মান হানিকর বলে তার মনে হলো।

মহারাজ এবার একটি ঘোষণা করলেন ঃ

আগামীকাল থেকে নর্তকী কুঞ্জকুট্টি দেবতার নাটমণ্ডপে নৃত্য পরিবেশন করতে না পারলেও নগরবাসীরা ইচ্ছা করলেই তার নৃত্য দর্শন করতে পারবেন। আজ থেকে তার পরিচয় হবে নগরনটী কুঞ্জকুট্টি। আমার প্রমোদ উদ্যানে নর্তকী তার পরিচারিকাটিকে নিয়ে আনন্দে বসবাস করবে। উদ্যানের সম্মুখে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নাট্যমঞ্চে বিভিন্ন উৎসবের রাতে নর্তকী তার নাচ পরিবেশন করবে। সেই মনোহর নৃত্য সর্বসাধারণ দর্শন করে আনন্দ লাভ করবেন।

সভাভঙ্গের পর সেদিনের মতো শিবিকায় তার পুরনো কুটিরে ফিরে গেল দেবদাসী। যেতে যেতে সে ভাবল, একদিকে কাপুরুষ, ভীতু, অতি স্বার্থপর এক পুরোহিত, অন্যদিকে সুকৌশলী, লালসাগ্রস্ত এক রাজা। নিজের ওপর ধিক্কার এলো তার। এতদিন

এদেরই লালসাগ্রস্ত দৃষ্টির সামনে সে নিজেকে অপবিত্র করেছে! এই রাজ্যের জন্য একবছর ধরে সে এতখানি স্বার্থত্যাগ করল! নিজেকে ধিক্কার জানানোর পর গভীর এক ধরনের বিষণ্নতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ধীরে ধীরে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল সে।

সন্ধ্যার দিকে কুঞ্জকুট্টি কাছে ডেকে নিল তার পরিচারিকাকে। তার বহুমূল্য কণ্ঠহার এবং অন্যান্য আভরণ দাসীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, আজ রাতে একটা ভাল্লমে চেপে তুই চলে যা এ রাজ্য ছেড়ে তোর রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে। এই অলঙ্কারের পয়সায় তুই দু'তিন পুরুষ সুখে কাটাতে পারবি।

পরিচারিকাটি পদব্রজে গিয়েছিল রাজসভায়। সে সবই শুনে এসেছিল নিজের কানে।

এবার সে-ই প্রশ্ন তুলল, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে?

ঠিক তোর উল্টোদিকে।

তবু কোথায়?

যেদিকে মন নিয়ে যাবে।

তবে আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছ না তোমার সঙ্গে?

এমন জায়গা আছে যেখানে মানুষ সহজে যেতে চায় না। তোকে বড় ভালবাসতাম, তাই তুই সংসারী হলে আমি যেখানেই থাকি না কেন সুখী হব।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল, তারপর দুটি ভাল্লম ভাড়া করে একেবারে উল্টোমুখে চলে গেল দুজনে।

সেদিন খর বায়ু বইছিল, উত্তাল ছিল সমুদ্র, কায়েলও ছিল অশান্ত।

ভাল্লম দুটি একেবারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দুজনে সকরুণ চোখে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে।

এইখানে পৌঁছে কতক্ষণ সাহির মাথা নিচু করে বসে রইল।

আঁখি বলল, এইখানেই কি গল্প শেষ হয় নাকি? পরিচারিকাটি না হয় সংসার জীবনে চলে গেল কিন্তু দেবদাসীর একটা পরিণতি চাই তো।

সাহির বলল, গল্পটা এখানে শেষ হলেই বুঝি ভাল ছিল, কিন্তু তা হয়নি। দেবরতিয়াল কুঞ্জকুট্টিকে সেই রাতেই দেখা গিয়েছিল

কোচিন দুর্গদ্বারে। সে দুর্গে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে সসম্ভ্রমে দ্বার খুলে দিল দ্বাররক্ষক। কুঞ্জকুট্টির জন্যই যে এ দুর্গ তাদের অধিকারে এসেছে তা সকলেরই জানা ছিল। তাই তাকে কেউ কোনো প্রশ্নই করল না।

নর্তকী ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দুর্গশীর্ষে। তাল-পাতায় সে দু'ছত্র পত্র রচনা করে এনেছিল। সেটি নিজের কবরীতে গেঁথে নিল।

আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রমা। জোয়ারের ডাক উঠেছে সমুদ্রে। জোনাকির মতো তরঙ্গ-শীর্ষে ঝিক্‌মিক্‌ করছে ফেনা। নিচে বিরাট আকারের সব শিলাস্তূপ। তারই তলায় ছলছল কলকল শব্দ তুলছে সমুদ্রজল।

কুঞ্জকুট্টির মনে হলো, মায়ের মতো মহাসমুদ্র তার অতল শান্তির কোলে তাকে ঠাঁই দেবার জন্য ডাক দিচ্ছে।

অতি ভোরে দুর্গরক্ষক অনন্তশয়নম্‌ সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসে দেখেন, নর্তকী কুঞ্জকুট্টির দেহ শিলাস্তূপের গায়ে সংলগ্ন হয়ে আছে। তিনি আরও দেখলেন, তার কবরীতে গাঁথা তালপাতার একটি পত্র।

তিনি আহত হৃদয়ে সেই পত্রটি পড়লেন ঃ

'আমার এ দেহ অগ্নিতে আহুতি না দিয়ে সমুদ্রের তলায় বিসর্জন দিলে আমার আত্মা শান্তিলাভ করবে। আমি দেবরতিয়াল, আমার দেহ আজও অশুদ্ধ হয়নি। এই পবিত্র দেহ নিয়ে মায়ের কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করতে চাই।

হে দয়ালু পথিক, তুমি আমার এই শেষ ইচ্ছাটুকু পূর্ণ কর।'

দুর্গরক্ষক অনন্তশয়নম্‌ মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এই দেবদাসীর ওপর। তিনি পোর্তুগীজ বন্দীদের মুখে শুনে-ছিলেন, এই দেবদাসী অত্যন্ত শুদ্ধ চরিত্রের। পুরো একটি বছর অত্যন্ত সংযম রক্ষা করে চলেছিলেন এই দুর্গে।

পরদিন খবর পেয়ে ছুটে এলেন মহারাজ, সঙ্গে মন্দিরের সেই পুরোহিত। সব শুনে রাজা ও পুরোহিত নতজানু হয়ে সেই পবিত্র বিদেহী আত্মার কাছে সকাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

দেবদাসীকে অজস্র পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হলো। একটি

প্রস্তরের সঙ্গে দেহটিকে আবদ্ধ করে সছিদ্র নৌকোয় ভাসিয়ে দেওয়া হলো ভাটার টানে।

আজও সমুদ্রের শীতল শয্যায় শুয়ে আছে সাগর-কন্যা। তার এলো চুলের রাশি শৈবালের মতো দুলছে জলের দোলায়। পায়ের কাছে বেজে চলেছে নুড়ির নূপুর। মাছেরা তাকে ঘিরে বসিয়েছে নাচের আসর।

॥ দুই ॥

তুমি এত কষ্টের কাহিনী বল কেন সাহির ?

আমার এ জীবনটা যে কষ্ট দিয়ে গড়া আঁখি।

কিসের কষ্ট তোমার ?

সে তুমি বুঝবে না।

আমি কতদিন তোমাকে কত কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি এড়িয়ে গেছ।

তোমাদের কষ্ট দেব না বলেই সরিয়ে এনেছি নিজেকে।

তুমি যখন বেহালাতে সুর তোল তখন কেন জানি না সাহির, আমার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।

আমার ঠিকই অনুমান, সারা কলামণ্ডপে তুমি সব থেকে বেশি সেন্টিমেন্টাল।

সমুদ্রের ধারে বালির ঢিবির ওপর হাতে মাথা পেতে শুয়েছিল আঁখি। বেহালা কোলে তার পাশে বসেছিল সাহির।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আঁখি বলল, আজ সমুদ্র ভারী গর্জন তুলেছে, আছড়ে পড়ছে ঢেউ। তুমি ঐ সুরে সুর মিলিয়ে বাজাও, আমি তোমার সুরে তাল মিলিয়ে নাচি।

কৈশোরে শেখা কত্থক নাচের সঙ্গে বেশ মিলে গেল সাহিরের বাজনা। আঁখি চোখের ইশারায়, হাতের মুদ্রায় সমুদ্রকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। প্রিয়তমকে কাছে পাবার গভীর আকুলতা ফুটে উঠছিল তার দেহভঙ্গিমায়। কর-চরণ বিন্যাসে সে কি নিঃশব্দ আহ্বান !

দ্রুতলয়ে বেজে চলেছে সাহিরের বেহালা। এগিয়ে আসছে কৃষ্ণনীল সমুদ্র। তরঙ্গ-শীর্ষে ঝলমল করছে হিরক-দ্যুতি। প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের জন্য সুসজ্জিত সমুদ্র।

আঁখি ঘূর্ণির পাকে ঘুরছে। প্রিয়তমকে পাবার আনন্দে সে অধীর।

বেলাভূমিতে সশব্দ উচ্ছ্বাসে আছড়ে পড়ল সমুদ্র। তেহাই দিয়ে থেমে গেল নাচ, থেমে গেল বাজনা।

শেষ রাতে বৃষ্টি নামল চড়বড়িয়ে। আঁখি তখন কেবিনের ভেতর গভীর ঘুমে মগ্ন। হঠাৎ কেবিনের খোলা জানালা দিয়ে কেউ যেন একমুঠো মল্লিকা ফুল ছুঁড়ে দিল তার বিছানায়। তড়বড়িয়ে উঠে বসল আঁখি। আকাশে চাঁদ নেই। মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক। একটু আগে বাতাসের ঝাপটায় মল্লিকা ফুলের মতো কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ঢুকে পড়েছিল।

আঁখি জানে, বাইরের খোলা পাটাতনে একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে থাকে সাহির। আর তার জন্যে সুদৃশ্য এই পালকি-ঘরের ব্যবস্থা।

দু'হাতে কেবিনের ভেজানো দরজা ঠেলল আঁখি। কিন্তু যত সহজে দরজা খুলে যায় তা আজ আর হলো না। তবে বাইরের থেকে দরজাটা খুলে দিল সাহির। সে বৃষ্টিতে এতক্ষণ ঐ দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে বসে ভিজছিল।

আঁখি তার হাত ধরে সজোরে টেনে নিল কেবিনের ভেতর। ভেজিয়ে দিল দরজা। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিল তার গা।

তারপর সুটকেস থেকে তোয়ালে বের করে ঘষে ঘষে মুছে দিল সাহিরের একমাথা ভেজা কোঁকড়া চুল।

এরপর সাহিরকে বলল, আমি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি মাখছি, তুমি ততক্ষণে তোমার ঝোলা থেকে কাপড় বের করে পরে নাও।

এই ভেজাটা পরেই তো বেশ আছি, শুকনোটা আবার ভিজবে।

কেন ?

এখনও রাত আছে, তুমি ঘুমুবে না নাকি ?

আঁখি বলল, সে আমি বুঝব, তুমি তোমার ড্রেসটা দয়া করে পাল্টে নিয়ে আমাকে উদ্ধার কর।

এমন একটা একান্ত আপনজনের স্পর্শ ছিল কথাটায় যাকে আর দ্বিতীয় কথা বলে অস্বীকার করার উপায় ছিল না সাহিরের। সে ঐ ছোট্ট ঘরটুকুর ভেতর পোশাক বদলে নিল।

এবার আমি তৈরি, তুমি তোমার বিছানা দখল করে শেষ রাতটুকু কাটিয়ে দাও।

আর তুমি ?

হাঁটু গেড়ে বসে জানালা দিয়ে বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি আল্লার দোয়া মাঙি।

তুমি যথাসময়ে অবশ্যই নামাজ পড়বে, কিন্তু এখনও তার সময় হয়েছে বলে মনে হয় না।

এখন তাহলে আমার কি করণীয়?

বেশ আরাম করে আমার বিছানায় জাঁকিয়ে বস। তারপর এখুনি আমি কফি তৈরি করছি, দুজনে মৌজ করে পান করা যাবে।

লণ্ঠন একটা কেবিনের কোণায় আধ নেবানো অবস্থায় জ্বলছিল। মাঝে মাঝে দু'এক ঝলক বাতাস ঢুকে পড়লেই আলোটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ঠিক যেন একটা ভীরু ছোট্ট হলুদ প্রজাপতির মতো।

সেই আধেক আলো-ছায়ায় কফি তৈরি হলো। দুজনে ঐ এক চিলতে বিছানায় বসল মুখোমুখি। হাতে কফির কাপ।

সাহির চুমুক দিয়ে একটা আরামের শব্দ তুলল।

আঁখি বলল, কেমন?

তোফা।

আচ্ছা কল্পনা কর, তোমাকে যদি বাকি রাতটুকু সিলিংয়ে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটু ভেঙে ঠায় বসে থাকতে হতো, তাহলে কেমন লাগত?

সাহির বলল, এত আরাম-আশকারা কি সইবে কপালে?

অসহ্যের কি হলো আবার?

ভালমন্দ খাইয়ে দিয়ে তুমি চলে গেলে দেশে। সকালে বিছানা থেকে উঠে যখন এক কাপ চা দেবারও লোক জুটবে না তখন এ দিনগুলোর কথা খুব বেশি করে মনে পড়বে।

আঁখি জানে সাহিরের মা নেই। তার বাবা দ্বিতীয়বার বড় এক ব্যবসাদারের একমাত্র মেয়েকে সাদি করে হায়দ্রাবাদে আলাদা সংসার পত্তন করেছেন। এক প্রায় অন্ধ বিধবা পিসি তাকে আগলে রেখেছে যখের ধনের মতো। বাবা কৃপা করে সাহিরকে বেশ বড় একটা নারকেল বাগান দিয়ে গেছেন। নিজের দু'দুটো নৌকোয় অঢেল নারকেল চালান যায়। ওর আয়ে আর শিবন আঙ্কেলের

কলামণ্ডপের মাহিনায় ওর দিব্যি চলে যায়।

দস্তুর মতো নামী এক গুরুর কাছ থেকে ও বেহালা শিখেছে। শুধু বেহালার ছড় টানতে শেখেনি, বাজনার ভেতর দিয়ে রাগ-রাগিণীর মূর্তি ফুটিয়ে তুলতে শিখেছে গভীর সাধনায়।

সাহিরের বাজনার একক অনুষ্ঠান হয়ে গেছে একাধিক জায়গায়। বহু পুরস্কারে সে সম্মানিত। বড় বড় কনসার্ট পার্টি থেকে তাকে দলভুক্ত হবার জন্য অনেক টাকার অফার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেশি টাকার লোভে সে শিবন সাহেবকে ছেড়ে যায়নি। সে জানে শিবন সাহেব ব্যবসার জন্য কলামণ্ডপ গড়েননি। সারা দেশ থেকে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী যোগাড় করে আনছেন তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য। এতেই তাঁর শান্তি, এতেই তাঁর প্রাপ্তি। সুতরাং অর্থের লোভে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

সাহিরের শেষ কথাটির সূত্র ধরে আঁখি বলল, সাদি করে একটি বউ আন না ঘরে, সে শুধু তোমার চা নয়, মোগলাই খানাও পাকিয়ে দেবে।

সাহির সোচ্ছ্বাসে বলল, দারুণ একটা সমাধানের পথ আজ বাতলে দিলে আঁখি। এ কথাটা কিন্তু আমার আগে কখনো মগজে ঢোকেনি।

আঁখি ধমকের সুরে বলল, থাম, আর নাটক করতে হবে না, আমি কিন্তু কথাটা সিরিয়াসলি বলছি।

তাহলে তো ভাবতে হয়।

আবার!

এবার আর কোনো কথা বলল না সাহির।

আঁখি খপ করে সাহিরের একখানা হাত ধরে বলল, প্লিজ, বন্ধুর কথাটা রাখ।

সাহির বেশ জোরের সঙ্গে বলল, তোমার হুঁশ আছে তো?

কেন?

আমার শরীরের অক্ষমতার কথা কি তোমার অজানা?

আঁখি অবাক হবার ভঙ্গি করে বলল, ঐ পায়ের একটু ডিফেক্টের জন্য তোমার বিয়ে হবে না, এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে!

সাহির বলল, বিশ্বাস করা আর না করা তোমার মর্জি, তবে

ইদানীং কোনো দুর্ভাগা পিতা তাঁর কন্যার বিবহ প্রস্তাব নিয়ে বড় একটা আসেন না।

আঁখি হাত তুলে দেখানোর ভঙ্গিতে বলল, এমন লম্বা, চওড়া, ফর্সা, সুপুরুষ মানুষ হাত বাড়ালেই কি পাওয়া যায়! তার ওপর সংসার চালানোর মতো সংগতির অভাব নেই। এদিকে স্বনামধন্য যন্ত্রসংগীত শিল্পী।

সাহির অমনি বলল, তার সঙ্গে যোগ করে দাও—নিজ হাতে ভাল্লম চালিয়ে বান্ধবীকে নিয়ে রাতের পর রাত কায়েল চষে বেড়ানোর ক্ষমতা রাখে।

এবার সাহিরের বুকে কয়েকটা চড়চাপড় কষিয়ে দিতে দিতে আনুনাসিক গলায় আঁখি বলল, দিলে তো আমার সিরিয়াস প্ল্যানটাকে ভণ্ডুল করে।

সাহির বলল, যে প্ল্যান কোনোদিনই কার্যকরী হবে না, সে রকম প্ল্যান তৈরি করে লাভ কি।

তুমি বুঝলে কি করে যে কার্যকরী হবে না?

সাহির বলল, এই প্রস্তাব নিয়ে দলে দলে না হলেও দু'দশ জন তো এক সময় এসেছিল।

তারপর?

আমি তাঁদের ভদ্রভাবে আপ্যায়ন করে ফিরিয়ে দিয়েছি।

কেন, তোমার যোগ্য নয় বলে?

একথা বল না। তারা অনেক গুণে গুণী। আমার বাজনা শুনে নাকি মুগ্ধ। কে বাবার একমাত্র মেয়ে, কেউ নামকরা সুন্দরী, শিক্ষিতা। তারা সবাই নাকি আমার পায়ের ডিফেক্টের কথা জেনেও এগিয়েছে।

তবে?

আমি সভয়ে পিছিয়ে এসেছি।

তোমার এ বৈরাগ্য কেন?

তুমি কি একান্তই কথাটা শুনবে আমার মুখ থেকে?

আমাকে অনুমান করতে দাও।

বল, আমার বিয়ে না করার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে?

বাঁ হাতের তর্জনী ঠোঁটে ঠেকিয়ে কিছু ভেবে নিয়ে আঁখি বলল,

তুমি বাউণ্ডুলে, যেখানে-সেখানে বেড়িয়ে বেড়াও। ঘর সামলাতে, মানে বউয়ের কাছে ঠিক মতো হাজিরা দিতে পারবে না বলে বিয়ের নামে পিছিয়ে যাও।

সাহির মাথা নেড়ে জানাল, এ অনুমানটি একেবারেই সঠিক নয়। এখন আরও কিছু অনুমান কর।

আঁখি এবার সোজাসুজি বলল, নিশ্চয়ই বুকের ভেতর কোনো চোট আছে, যে কারণে নতুন করে আর কোনো সাংসারিক চোট-পাটের মুখোমুখি হতে চাইছ না।

এবার আঁখির হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে সাহির বলল, বন্ধু, কারো অনুমানই আমার দুর্ভাগ্যের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

আঁখি বলল, তবে আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই।

সাহির বলল, এই তো গান-বাজনা, বন্ধুবান্ধবী নিয়ে মনের খুশীতে দিব্যি আছি আঁখি, নাইবা দেখলাম সংসার রচনার স্বপ্ন।

তবুও মানুষ একান্ত প্রিয়জনকে নিয়ে ঘর বাঁধে সাহির। তাকে অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ আর অনেক আনন্দের সঙ্গী হিসেবে কাছে পেতে চায়। যা ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে দেওয়া যায় না তা স্বামী-স্ত্রী নির্দ্বিধায় ভাগ করে নেয়।

সাহির এবার যেন গভীর হলো। সে বলল, একজন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক বিয়ে করতে চায় না, এর পেছনে যে কী নিদারুণ ব্যথা লুকিয়ে আছে তা বলে বোঝানো যায় না। তবে তোমাকে আমি আর অন্ধকারে রাখতে চাই না আঁখি। কেন জানি না কলামণ্ডপে আমার এত বন্ধুজন থাকা সত্ত্বেও তোমাকেই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে মনে হয়েছে। আমাদের দুজনের বয়সের পাঁচ-সাত বছর তফাৎকে তুমি কেমন সহজ, অন্তরঙ্গ ডাকে ঘুচিয়ে দিয়েছ।

আমি তোমাকে, তোমার বাজনাকে বড় ভালবাসি সাহির।

এই ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমার ভাগ্যের কথা শুনে দুঃখ পেও না, তাহলে আমার মুখের এই হাসিটুকুও মুছে যাবে।

ছাদের ওপর ঝেঁপে বৃষ্টি নামার শব্দ।

জানালাটা টেনে বন্ধ করতে গেল আঁখি। সাহির তার হাত ধরে বাধা দিল।

আজ সমস্ত প্রকৃতি আমার অনুকূল। ওরা আমার গোপন কথাটি শুনতে চাইছে। ওদের এই চোখের জল আমার বুকের কষ্টকে অনেকখানি হালকা করে দেবে।

এবার সাহিরের দুটো হাত ধরল আঁখি। কাতর গলায় বলল, সে যা হোক, আমি আর কিছু শুনতে চাই না। তুমি যেমন আনন্দে ছিলে তেমনি থাক।

সাহির বলল, বোতলের ছিপিটা যে খোলা হয়ে গেছে আঁখি। এখুনি বেরিয়ে আসবে সেই আরব্য রজনীর দৈত্যটা। ভয় পেও না, সহজভাবে তার মুখোমুখি দাঁড়াও।

আলোটা মোটামুটি সুরক্ষিত একটা কোনায় রাখা হলেও তার শিখা নাচছিল। সেই আলোয় সাহির আর আঁখির দুটো ছায়া দেওয়ালে প্রায় মিলেমিশে অভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

আঁখি মনে জোর এনে বলল, বল, আমি তৈরি।

সাহির যেন সম্পূর্ণ অচেনা কোনো মানুষ। বড় নিরাসক্ত গলায় সে কথা বলছিল।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নিশ্চিত মৃত্যু গ্রাস করছে। চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে পায়ের গোছ। এরপর একে একে জানু, কটি, বুক, সর্বাঙ্গ। এবার বল, সেই হতভাগ্য এ অবস্থায় তার একান্ত কোনো প্রিয়জনকে কি কাছে টানতে পারে?

আঁখি বলল, সত্যি, তুমি শুরুতেই কেমন ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। আমি আমার মনের সবটুকু জোর হারিয়ে ফেলছি।

সাহির এখন সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন। সে এখন তার জীবনের এক নিষ্ঠুরতম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এবার নিজের জিজ্ঞাসার উত্তর সে নিজেই দিল, না, একান্ত প্রিয়জনকে সে কাছে টানতে পারে না। তিলে তিলে মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন, অবশেষে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের মতো সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে। তবে পূর্ণগ্রাসের পর চন্দ্রসূর্যের মুক্তি আছে, কিন্তু মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর ছোবল থেকে আক্রান্ত মানুষটির কোনোভাবেই রেহাই নেই।

আঁখি কান্নাভেজা স্বরে বলল, দোহাই তোমার সাহির, একটু সহজ হও। হেঁয়ালি রেখে আসল কথাটি বল।

সাহির বলল, আমি এমন এক যুবক যার স্নায়ুর কোনো রোগ

নেই। কিন্তু দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছে আমার মাংসপেশী। পেশীগুলো ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে।

তোমার এ অসুখ কবে থেকে শুরু হয়েছে সাহির ?

অল্প বয়স থেকেই মনে হয় শুরু হয়েছে, কিন্তু তখন কেউ সেদিকে বড় একটা নজর দেননি। আসলে নজর দেবার মতো অবস্থা তখন আমার সংসারের ছিল না। বাবা মাত্রাছাড়া ড্রিঙ্ক করতেন। মায়ের সঙ্গে তীব্র বচসা হতো। কারণে-অকারণে আমাকে বেধড়ক মারতেন। সংসারের এই পরিস্থিতির ভেতর কয়েকটা বছর কেটে গেল। প্রথম দিকে কয়েক রকম গাছগাছালি, শেকড়-বাকড় দিয়ে চিকিৎসা হয়েছে। ফল হয়নি। পরে হস্‌পিটালে গিয়ে সঠিক রোগটি ধরার জন্য ইলেক্টো-মাইওগ্রাফি আর পেশীর বাইয়পসি করা হয়। তাতেই নিশ্চিত হওয়া যায় আমি মাইওপ্যাথি রোগে আক্রান্ত, আর ধীরে ধীরে এ রোগ আমাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

আঁখি তখন উদ্‌ভ্রান্ত। সে জানতে চাইল, এর কি কোনো চিকিৎসা নেই?

সাহির মাথা নাড়ল, না। কেবল ফিজিওথেরাপি করলে কিছুটা কর্মক্ষম থাকা যায়। আমার ক্ষেত্রেও এখন তাই চলছে।

বুকের কাছে ঝুঁকে এলো আঁখির মাথাটা। সারা আরব সাগরের ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল তার মনের ওপর।

দু'হাতের পাতায় সাহির তুলে ধরল আঁখির ভেঙে পড়া মুখখানা।

আঁখি এবার নিজের দু'হাত তুলে ঝরে পড়া চোখের জল ঢাকল।

সাহির তাকে নাড়া দিয়ে বলল, এত সেন্টিমেন্টাল হচ্ছ কেন? আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, দুঃখের কোনো ছাপ কি আমার চোখে-মুখে আছে ?

আঁখি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সাহিরের মুখের দিকে। তার পলক পড়ছিল না। এই সেই মানুষ যে হাসিমুখে সঙ্গী করেছে মৃত্যুকে! যে যুবক পাঁচ পাঁচটি বছর ধরে কলামণ্ডপকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে খুশির জোয়ারে, তাকে দেখে কেউ কি ভাবতে পেরেছে ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘুরছে তার পায়ে পায়ে।

আঁখি বলল, আমাদের ধর্মে 'অমৃতের পুত্র' বলে একটি কথা আছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, সত্যিকারের অমৃতের পুত্র তুমি।

এবার একটু ভাবালু হয়ে পড়ল সাহির। বলল, মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়ে আছি, কিন্তু দুঃখ কোথায় জান, সংগীত শিক্ষাটা আমার সম্পূর্ণ হলো না। কত রাগরাগিণীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুরগুলো আমার অধরা থেকে গেল। কত রাতে আমার মাথার বালিশ ভিজেছে চোখের জলে শুধু সুরের পাখিগুলোকে ধরতে পারিনি বলে। এ যে কী যন্ত্রণা তা বলে বোঝাতে পারব না। ঘুমের ভেতরে বাজনা শুনি, কে যেন এক মহাশিল্পী বাজিয়ে চলেছেন। আমার কত অজানা দিকের জানালা খুলে যাচ্ছে। আমি সুরের ধারায় প্লাবিত হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, কেউ কোথাও নেই। বেহালা নিয়ে বসে যাই, কিন্তু সেই স্বপ্নে শোনা সুর আর যন্ত্রে ধরা দেয় না।

আঁখি বুঝল সাহিরের বেদনার ক্ষতমুখটা খুলে গেছে। সে এখন বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছে।

কথান্তরে যেতে চাইল আঁখি। তার সমস্ত মন অব্যক্ত ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও সে এই মুহূর্তে দুঃখের কোনো প্রসঙ্গ থেকে সাহিরকে সরিয়ে আনতে চাইল।

এসো সাহির, আমরা শেষ রাতে একসঙ্গে বসে বৃষ্টিটুকু উপভোগ করি।

নিজেই ছোট্ট জানালাটা হাত দিয়ে ঠেলে খুলে দিল আঁখি।

ঝড়ের ঝাপ্‌টা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে হাঁকডাকহীন বিদ্যুতের চমক। বৃষ্টি এখন ঝিমঝিম।

আঁখি আবার বলল, ভিজতে খুব ইচ্ছে করছে।

সাহির বাধা দিয়ে বলল, প্লিজ, ও কাজটা এখন আর কর না। মায়ের কাছে গিয়ে যত পার স্নান কর বৃষ্টির জলে।

আঁখি বলল, আচ্ছা, মা আমাকে চিঠি পাওয়ামাত্র পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরতে বলল কেন, অনুমান করতে পার ?

হয়তো কোনো ভাল ছেলে পাওয়া গেছে, হাতছাড়া করতে চান না।

আঁখি ঐ মৃত্যুপথযাত্রীটির বুকেও দুটি ঘুষি মারল, আবার সহানুভূতির হাত বুলিয়ে দিল।

সাহির বলল, আমি তো কোনোদিন সাদির স্বাদ পাব না, তবে বন্ধুদের সাদির খবর পেলে মনে মনে দারুণ খুশি হব।

হঠাৎ কথাটা বাজল আঁখির বুকে। সমস্ত প্রকৃতির মেঘভার, কান্না আর হতাশ হাওয়ার হাহাকারে সাহিরের না পাওয়ার বেদনাটুকু যেন ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল।

পরদিন মেঘমুক্ত ঝকঝকে আকাশ, সোনালী রোদ্দুর, উজ্জ্বল ভোর।

সাহিরের চুরুলন ভাল্লম এগিয়ে চলেছে দ্রুত। ত্রিবান্দ্রম থেকে তিরুর পর্যন্ত প্রসারিত এই জলপথ। নদী, কায়েল, লেগুন, লেক মিলে জলের জাল বিছানো।

দুপুরের দিকে মনে হলো, একটা গঞ্জের হাটের পাশ দিয়ে ওরা যাচ্ছে। ছোট-বড় অনেকগুলো নৌকো দু'তিনটে জলপথ বেয়ে এসে গঞ্জে ভিড় জমিয়েছে। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো দূর থেকে ভেসে আসছে কোলাহল। গ্রাম্য বাজারের একটা মিশ্রিত শব্দ আছে।

সহসা পালকি-ঘরের ভেতর থেকে আঁখি বলল, গঞ্জের হাটের গায়ে তোমার ভাল্লমটা একটু ভেড়াবে?

সাহির দাঁড় টানতে টানতে বলল, কেনাকাটা কিছু আছে নাকি? আমাদের আজই কিন্তু শেষ রজনী। বোধহয় রসদ প্রয়োজনের কিছু বেশিই রয়েছে।

আমার সামান্য কিছু জিনিসের দরকার।

ভাল্লমটা তীরে ভেড়াল সাহির।

বল, কি আনতে হবে?

উচ্ছল আঁখি আজ সারাদিন বড় শান্ত। প্রয়োজনের দু'চারটি কথা ছাড়া প্রায় নিজের ভেতর ডুবে আছে।

সাহিরের কথার উত্তরে সে বলল, একটা দারুচিনির প্যাকেট এনো, কিছু ফুল, আর পাওয়া গেলে একটা মালাও এনো।

এই গঞ্জের থেকে অনেক ভাল জিনিস তুমি এর্নাকুলমের মার্কেটে পাবে।

আঁখি বলল, চারদিকে জলের স্রোত, ঘন সবুজ প্রকৃতি, নৌকোর মিছিল, গ্রাম্য মানুষ তাদের তৈরি জিনিস নিয়ে বসেছে, এর গন্ধই আলাদা।

বেশ তাই হবে। কিন্তু দারুচিনির প্যাকেট কি তুমি দেশে নিয়ে যাবে ? একটু বড় আনব কি ?

ছোট-বড় যেমন পাও। ওর গন্ধ আর আস্বাদে কেরালার দারুচিনি বনের কথা মনে পড়বে। ইডিক্কির মুনারে দারুচিনি আর এলাচের বন দেখতে গিয়েছিলাম না আমরা ?

সাহির বলল, জ্যোৎস্না রাতে দারুচিনি বনের ভেতর ঘোরা, গাছের ডালে ডালে ঘষা লেগে ঠিক যেন নূপুরের ঝংকার, তোমরা নাচলে আমি বাজালাম, সে স্মৃতি কি ভোলার !

সন্ধ্যা নেমে এলো। সমুদ্রের ধারে কায়েলের গায়ে ভাল্লমখানা বাঁধল সাহির।

আঁখি বলল, চল, সাগরে সূর্যাস্ত দেখে আসি।

ওরা পাথরের ছোট একটা টিলার ওপর উঠল। গোটা পাঁচেক নারকেল গাছ টিলার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। টিলার পরেই বালির রাশি শেষ হয়েছে একেবারে সমুদ্রে গিয়ে।

লাল সূর্যটা ডুবছে পশ্চিম সমুদ্রে। তাকে যেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ঢেউগুলো মাথা তুলছে, আবার প্রণত হচ্ছে। দুটো নৌকো বালির জমিনে পড়ে আছে পাশাপাশি। কালো গায়ে সাদার আঁকিবুকি কাটা।

আঁখি বলল, এসো এই টিলার ওপরেই বসি।

দুজনে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

আজ অনেকগুলো ফুল পাওয়া গেছে গঞ্জের হাটে। মল্লাপুপুর (মল্লিকা ফুলের) একটি গোড়ে মালা, মাঝে মাঝে সবুজ পাতা আর ছোট ছোট পিঙ্ক রঙের ফুল দিয়ে গাঁথা।

আঁখি সাজতে ভালবাসে। সে এরই ভেতর ফুল গুঁজেছে খোঁপায়। এক থোকা পিঙ্ক রঙের ডিসেম্বর ফুল। এই অপরূপ ফুলগুলোর নামই ডিসেম্বর। কোনো বিদেশী পুষ্পপ্রেমী এই নামকরণ করে থাকবেন।

মল্লিকার সেই গোড়ে মালাটি গলায় দুলিয়েছে আঁখি। পরনে

সাদা সিল্কের একখানা নেরিয়দ। বুক থেকে পা অব্দি নেমে গেছে নাইটির মতো। মালাটি কণ্ঠ বেষ্টন করে বুকের উপত্যকা বেয়ে নেমেছে নাভিদেশ পর্যন্ত। মাথায় সোনালী জরির কাজ করা রক্তিম আভার একটি ওড়না।

আঁখি বলল, তুমি এই টিলার ওপর মহাদেবের মতো বসে তোমার বেহালাটি বাজাও। আমি অস্তভানুকে সমুদ্র-জলের অঞ্জলি দিয়ে আসছি।

সুসজ্জিতা তরুণী যেন বিয়ের সাজে সজ্জিতা কুমারী পার্বতী।

আঁখি নেমে গেল নর্তকীর ছন্দিত পদসঞ্চারে।

সে সমুদ্রতীরে পেঁছে অঞ্জলি উৎসর্গ করল অস্তাচলগামী দেব দিবাকরের উদ্দেশে।

ফিরে এল সেই টিলার নিচে। এবার একই স্থানে দাঁড়িয়ে ঝড়ের হাওয়ায় দুলে ওঠা নারকেল গাছটির মতো সে দুলতে লাগল। তার সরল মেরুদণ্ডটি যেন নারকেল গাছের কাণ্ড। সুগঠিত স্তন-যুগল যেন বৃক্ষের সুপুষ্ট ফলসম্ভার। দীর্ঘ পত্রযুক্ত আন্দোলিত শাখা নর্তকীর সঞ্চালিত বাহুযুগল।

সব আন্দোলনের শেষে যুক্ত করে নতমস্তকে মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করল পার্বতী।

বাজনা থেমে গেছে। মুগ্ধ চোখে আঁখির নৃত্যলীলা দেখছে সাহির।

এখন গোধূলি লগ্ন। মিলন সমুৎসুক সমুদ্র পাখিরা বেলা-শেষের হাওয়ায় আনন্দ-নৃত্যে মেতে চক্রাকারে ঘুরছে।

এবার অতি সাবধানে নিচে নেমে এলো সুরশিল্পী। তখনও আঁখির আঁখি উন্মীলিত হয়নি। নতজানু, প্রণতি-মুদ্রায় যুক্ত কর।

নৃত্যশিল্পীর পাশে এসে দাঁড়াল সুর-শিল্পী। অপূর্ব এক যুগল-বন্দী। দৃষ্টিনন্দন, শ্রুতি-সুখকর।

আঁখি চোখ মেলে উঠে দাঁড়াল। পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে সাহির, কিছুটা বিস্মিত।

আঁখি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল, সে সাহিরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সাহির সরে গিয়ে বলল, আজ এ কি খেয়াল !

লাজুক গলায় আঁখি বলল, তুমি বড় তাই প্রণাম করলাম।

কাছে সরে এসে সাহির ঈষৎ মাথা নিচু করে বলল, বয়সে আমি বড় ঠিক তবে তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা করি বন্ধুর মতো।

তুমি আমার বন্ধুই, আজ থেকে তার চেয়েও ঘনিষ্ঠ।

বলতে বলতে নিজের গলার মালাটি খুলে সাহিরের গলায় পরিয়ে দিল।

সাহির বাধা দিল না। বলল, বিদায়ের করুণ গন্ধমাখা বন্ধুর হাতের মালাটির কথা আমৃত্যু মনে থাকবে।

হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় আঁখি বলল, এ মালার মূল্য আরও কিছু বেশী সাহির। গোধূলি লগ্নে ওপরে অনন্ত আকাশ আর সামনে অকূল সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে আমি তোমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করলাম।

এতক্ষণ সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ করছিল সাহির। এই মুহূর্তে আঁখির কথা শুনে সে তড়িতাহতের মতো চমকে উঠল।

তুমি কি সচেতন অবস্থায় কথাগুলো বলছ আঁখি! আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমরা দুজন কি কোনো স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছি নাকি ?

আঁখি সাহিরের আরও কাছে সরে গিয়ে তার বুকের ভেতর হাত রেখে বলল, সামনের ঐ সমুদ্রের মতো আমার কথাগুলো সত্য সাহির।

এ অন্যায়, আমার দিক থেকে এত বড় অনিষ্ট আমি হতে দেব না।

এবার আঁখি ওর বুকে নিজের মাথাটা ঠেকিয়ে বলল, আমি তোমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছি, এখন ত্যাগ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে তোমার হাতে।

সাহির একখানা ক্রাচ ফেলে দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল আঁখিকে। বলল, যে কোনো মুহূর্তে যাকে মৃত্যু টেনে নেবে, সেই অভিশপ্ত মানুষটাকে তুমি জীবনের এতখানি উত্তাপ দিচ্ছ কি করে !

আঁখি বলল, মৃত্যু তোমার বিয়ের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ আমি হতে দেব না।

সাহির বলল, বেশ, বন্ধুর জন্যে তোমার সেন্টিমেন্টকে আমি সম্মান জানাচ্ছি, কিন্তু আমার একটি শর্ত তোমাকে মেনে নিতে হবে। কথা দাও।

আঁখি বলল, আমার ইচ্ছার মর্যাদা রেখে তুমি আমাকে যে শান্তি আর তৃপ্তি দিলে, তার পরিবর্তে আমি তোমার দেওয়া যে কোনো শর্ত মেনে নেব।

তুমি মনে মনে নিশ্চিতভাবে প্রস্তুত হয়ে কথা বলছ তো?

হ্যাঁ, সাহির, এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী কেউ নেই, তাই তোমার শর্ত আমি আনন্দে মেনে নেব।

সাহির বেশ গভীর গলায় বলল, তোমাকে আমি শুধু আজ রাতটির মতো স্ত্রীর সবরকম মর্যাদা দেব। কাল ভোরের সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর তোমার স্বামী নয়, আগের মতো অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই শর্ত তোমাকে মেনে নিতে হবে। আর একটি কথা, এরপর বিয়ে করে সংসারী হতে তুমি কোনোরকম দ্বিধা করবে না।

আঁখি বলল, কথা যখন দিয়েছি তখন তাই মেনে নেব। তবে তোমাকে আমি এ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।

মনে রেখো, তবে বন্ধু হিসেবে, অন্য কোনোভাবে নয়।

চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয় আঁখি, এ রাতকে তোমার জীবনের পাতা থেকে মুছে ফেলতে হবে।

তুমি পারবে তো?

পারতে হবে আমাকে, শুধু তোমার সুখী আর উদ্বেগহীন ভবিষ্যৎ সংসার জীবনের কথা ভেবে।

আমিও পারব। তবে আজ রাতটুকু তোমাকে নিবিড় করে কাছে পেতে দাও। আর তুমিও ভাব, তোমার জীবনের অপূর্ণ একটা ইচ্ছার স্বাদ তুমি আমাকে নিয়ে পূর্ণ করলে।

॥ তিন ॥

মাদ্রাজ মেল ঢুকল হাওড়া স্টেশানে। লেট ছিল গাড়ি প্রায় দু'ঘণ্টা। বিশাখা দেবী ঠায় বসেছিলেন প্ল্যাটফর্মে। গাড়ি ঢুকতেই গেটের কাছাকাছি চলে গেলেন। ওখান থেকে ভালভাবে নজর রাখা যাবে গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের ওপর।

একা একা আসছে মেয়েটা এতগুলো বছর পরে। সেই কিশোরী চতুর্দশী গিয়েছিল পাঁচ বছর আগে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে, আজ ফিরে আসছে দেহে-মনে সাবালিকা হয়ে। আজ বেঁচে থাকলে যে মানুষটি সবচেয়ে খুশি হয়ে মেয়েকে নিতে ছুটে আসতেন, তিনি চলে গেছেন সব খেলার পারে।

ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল বিশাখা দেবীর। তিনি রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। সেই মানুষটির কথা মনে এলে চোখের জল যেন বাঁধ মানে না।

এবার চোখ মুছে সামনে তাকিয়ে দেখেন, মেয়ে এগিয়ে আসছে।

আঁখি দ্রুত পায়ে গেটের পাশে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। বিশাখা দেবী যাত্রী চলাচল পথের একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও নিজের ভাবাবেগটুকু সামলাতে পারলেন না। মেয়ের মাথায় মুখ গুঁজে আদর জানালেন। পরে দু'হাতে মেয়ের মুখ তুলে ধরে দেখেন, মেয়ে ইতিমধ্যে চোখের জলে মুখ ভিজিয়েছে।

এত কাঁদছিস কেন মা, এই তো আমি তোর কাছেই রয়েছি।

কিন্তু পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষের এই তরুণী কন্যার চোখে সহসা কেন জলের বন্যা বইল তার সঠিক খবর কেউ পেল না। শুধু একটি রাতে তার দেহমনের ওপর যে ব্যাকুল বসন্ত খেলা করে গেছে, যার উত্তপ্ত স্মৃতি সে ধরে রেখেছিল সারাপথ, তার সৌরভ বিলীন হলো এই মহানগরীতে পা দিয়ে। হয়তো তাই তার এ অঝোর অশ্রুপাত। যাকে ভুলে যেতে হবে, যাকে কোনোদিন আর সে পাবে না, যে মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ আস্বাদ নিল, তাকে মনে পড়ার অর্থ চোখের জলের বন্যা বয়ে যাওয়া।

বিশাখা দেবী ট্যাক্সি নিয়ে তাঁর সন্তোষপুরের বাড়িতে চলে এলেন।

আসার পথে বললেন, এই পাঁচ বছরে কত বাড়িঘর উঠেছে দেখতে পাচ্ছিস?

আঁখি দু'দিকে চোখ বোলাচ্ছিল।

আমি তো চিনতেই পারছি না পাঁচ বছর আগেকার বাড়িগুলো।

বিশাখা দেবী বললেন, এদিকে-ওদিকে অনেক নতুন বাড়ি উঠে গেছে, তাই।

আঁখি বলল, তার ভেতর থেকেও দু'একখানা বাড়ি আমি ঠিক চিনে নিয়েছি। ভোলা দাদুর বাড়িতে আমি অঙ্ক কষতে আসতাম। সে বাড়ি তেমনি আছে।

বিশাখা দেবী বললেন, বড় ভাল মানুষ ছিলেন। দু'বছর হলো মারা গেছেন।

লেক পেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল।

আঁখি দেখল বাড়িটা ঝকঝকে রঙ করা। ঈষৎ বাফ্ কালার। পাথরের মতো চকচক করছে।

ওমা, বাড়ির ওপর দোতলা একখানা বড় ঘর দেখছি, ওটা হলো কবে? আমি তো দেখিনি মা।

গত ডিসেম্বরে। ওটা তোর থাকার আর নাচের ঘর। অবশ্য যে ক'দিন আমার কাছে থাকবি।

মা, অপূর্ব তোমার টেস্ট! কি চমৎকার হালকা ভায়োলেট রঙের বোগেনভিলিয়ার ঝাড় উঠিয়েছ। থোকা থোকা ফুল। ওপরের ঘরের ছাদ অব্দি উঠে গেছে।

তুই আগে ঘরে ঢোক, তারপর কথা হবে।

ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ফুলি। সে এতক্ষণ জানলা খুলে বসেছিল। আঁখি দেখেনি ফুলিকে। এই তিন বছর হলো কাজে এসেছে। সুন্দরবনের বাসিন্দে। কথা মনের মতো না হলে গলা উচ্চগ্রামে তুলে প্রতিবাদ জানায়। ঘরে-বাইরে সমান আচরণ তার। প্রতিবেশিনীরা অনুচ্চে বলেন, বাঘিনী। তবে ষোল আনা খাঁটি স্বভাবের মেয়ে।

ফুলি একমুখ হেসে নতুন আগন্তুকের দুটো ব্যাগ তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

বিশাখা দেবী চেঁচিয়ে বললেন, ওগুলো ওপরে দিদির ঘরে নিয়ে যা।

ওপরের ঘরখানা বেশ বড়। তার একদিকের দেওয়ালে একখানা সিঙ্গল খাট। উঁচু বিছানা। মণিপুরী কাজকরা চাদর পাতা। পাশেই জানালা। ধবধবে সাদা রঙের সুদৃশ্য গ্রীল, হালকা পিঙ্ক রঙের পর্দা উড়ছে। সাদা টাইলসের ঝকঝকে মেজে। খাটের একপাশে টেবল চেয়ার। মেহগিনি কাঠের তৈরি, পালিশ করা। আঁখির বাবার বড় প্রিয় ছিল এ দুটো জিনিস। ঘরের এককোণে টিপয়ের ওপর পেতলের কলসে সিঁদুর রঙের গোলাপের ঝাড়।

বিশাখা দেবী বললেন, একেবারে নতুন বাথরুম। সবকিছু দেওয়া আছে, স্নানটান সেরে ফ্রেশ হয়ে নিচে নেমে আয়।

পরের দিন দশটায় সব ব্যবস্থা করে বিশাখা দেবী তাঁর স্কুলে গেলেন। রান্নাঘরে বসে ফুলির সঙ্গে আঁখি গল্প করতে লাগল। ফুলি বিকেলের জলখাবার তৈরি করতে করতে গল্প শুনছিল।

ও দেশটা কি সোঁদরবনের মতো গো দিদি? অমন নদী, সমুদ্দুর, জঙ্গল আছে?

সে সব তো আছেই, তার ওপর পাহাড় আছে।

একটু যেন মনে মনে দমে গেল ফুলি। তার ধারণা, সুন্দরবনের মতো দেশ ভূ-ভারতে নেই। সে এবার তার শেষ অস্ত্রটি হানল, আমাদের দেশের মতো এতো বড় বড় বাঘ আছে?

না, তা হয়তো নেই, তবে মস্ত বড় বড় হাতি আছে।

বাঘের মাহাত্ম্য বেশী কি হাতির তা জানা না থাকায় ফুলি চুপ করে যায়। বেফাঁস কোনো কথা বলে বোকা সাজতে চায় না সে। একবার চিড়িয়াখানা গিয়ে সবরকম জানোয়ার পরিদর্শন করে মনে মনে জন্তুদের ছবি এঁকে রেখেছিল। এখন পাশাপাশি বাঘ আর হাতির দুটো ছবি মিলিয়ে দেখল। না,হাতির পাল্লাটাই ভারী। বেশ ভারিক্কি, মোটাসোটা গড়নের। বাড়তি একখানা লম্বা শুঁড় আছে।

প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে ফুলি বলল, হ্যাঁ দিদি, ও দেশের মেয়েরা আমাদের মতো কাজকর্ম করে তো?

প্রায় সবই একরকম, ঘরের কাজ থেকে ক্ষেত-খামারের কাজ, কোনো তফাৎই নেই।

এবার আঁখি বলল, আমাদের দেশের সঙ্গে ওদেশের খুব মিল আছে। আমাদের গ্রামগুলোতে যেমন অনেক নারকেল গাছ আছে, ওদেরও তেমনি আছে।

ফুলি বলল, তাই নাকি, সেখানেও এত নারকেল গাছ?

এখানকার চেয়ে আরও অনেক বেশী। আর ঐ নারকেল গাছ থেকে ওদের প্রচুর রোজগার। এ কাজের বেশীর ভাগটাই মেয়েরা করে। ঐ যে মায়ের ঘরে নতুন পাপোশটা এনে দিয়েছি, ওটা নারকেল ছোবড়ার দড়িতে তৈরি। ঐ ডিজাইন আর বুনুনি দক্ষ কারিগররা করলেও ছোবড়া পিটিয়ে দড়ি তৈরির কাজটা বেশির ভাগ মেয়েরাই করে।

ফুলি গল্প পেলেই জমে যায়। সে চপের জন্যে মাছের পুর তৈরি করতে করতেই বলল, ছোবড়া থেকে দড়ি কেমন করে মেয়েরা তৈরি করে গো দিদি?

তার আগে তোমাকে ছোবড়া তৈরির ব্যাপারটাই জানতে হবে।

কিরকম?

এই ধর, যে কোনো একটা জলা জায়গার খানিকটা অংশ জাল দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে।

ওরা আমাদের মতো কথা বলে?

আঁখি বলল, কথা নিশ্চয়ই বলে তবে আমাদের ভাষায় নয়।

আচ্ছা দিদি, ওরা ঐ জালকে ওদের ভাষায় কি বলে?

কায়ার ভাল্লম। তারপর শোন, ঐ জালের ভেতর নারকেল পাতা বুনে তৈরি করে 'ওলা'।

ফুলি বলল, 'দোলা'? এ তো আমাদের ভাষা গো!

আঁখি কথাটা শুধরে দিয়ে বলল, দোলা নয়, ওলা। তবে বলতে পার দোলার মতো একটা জিনিস। ওতেই ওরা নারকেলের ছোবড়াগুলো ফেলে দেয়। ওগুলো তিন মাস ধরে ওর ভেতর পচতে থাকে। নারকেল ছোবড়ার কষে জল একেবারে কালো হয়ে যায়। তিন মাস পরে ছোবড়াগুলো ডাঙায় তোলা হয়।

তারপর ঐ পচা ছোবড়াগুলো নিয়ে ওরা কাঠের পিটুনি দিয়ে

পেটাই করতে থাকে। আস্তে আস্তে খোসা থেকে বেরিয়ে আসে সুতোর মতো আঁশ।

ফুলি বলল, জলে পাট পিটিয়ে যেমন আঁশ বের করে গো।

ঠিক বলেছ।

এরপর ঐ আঁশগুলো দিয়ে কি হয় দিদি ?

ঐ আঁশগুলো তখন অপরিষ্কার থাকে। ওগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার করে নেবার জন্য তাট্টু মেশিনে পাঠানো হয়।

ফুলি এবার আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠল, ঐ তো আর একটা কথা দিদি আমাদের সঙ্গে মিলে গেল।

কি কথা মিলল আবার ?

ঐ যে তুমি টাট্টু বললে।

হো হো করে হেসে উঠে আঁখি বলল, ওটা তোমার টাট্টু ঘোড়া নয়, ও হলো তাট্টু মেশিন। ঐ মেশিনে নারকেল ছোবড়ার আঁশ-গুলো পরিষ্কার হবার পর তাকে বলে, চাকিরি তুম্বু। ঐ পরিষ্কার আঁশগুলো পাট করে মেয়েরা পেটের কাছে চেপে ধরে। ওর থেকে খানিকটা অংশ মেশিনের মুখে ধরিয়ে দেয়। মেশিন ঘুরে চলে আর দড়ি বেরিয়ে আসতে থাকে।

আঁখি থামলে ফুলি চোখ বড় বড় করে গালে হাত ঠেকিয়ে বলল, তুমি এত জান দিদি! আমরা নেকাপড়া না শিখে মুখ্যুসুখ্যু হয়ে রইলাম।

আঁখি বলল, ফুলিদি, তোমার কড়ার তেল গরম হয়ে গেছে। আমি চপ গড়ে দিচ্ছি, তুমি ভাজতে থাক।

ফুলি মায়ের কাছ থেকে নাকি খাবার তৈরিতে 'এসপাট' হয়ে গেছে। যেটা আবার মা পারে না সেটাও ফুলি পারে। সেটা হলো, সরুচাকলি। যেমন কাগজের মতো পাতলা, তেমনি ধবধবে সাদা। এ ব্যাপারে মা নাকি ফুলিকে বলেছে, 'তুই ফাস্ট কেলাস ফাস্ট'।

এসব কথা চপ ভাজার ফাঁকে ফাঁকে ফুলির পরিবেশন। ফুলি বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, যে সে লোক আমাকে 'ফাস্ট কেলাস' বলেনি গো দিদি, মস্ত বড় ইস্কুল, যেখানে মেলার মতো গিজগিজ করছে পড়ুয়ারা, সেখানকার বড় দিদিমণি আমাকে 'সার্টিফিট' দিয়েছে।

আঁখি বলল, পঁচিশটা চপ কে খাবে ফুলিদি ?

আজ মা বলে গেছে আরও তিন-চারজন দিদিমণি তেনার সঙ্গে আসবেন।

বিকেলে ট্রেনের বাঁশি শুনে ফুলি ওপরে উঠে গিয়ে ডাক পাড়ল, দিদি, ছ'টার 'টিরেন' এসে গেছে। মা এখন দিদিমণিদের সঙ্গে 'পিলাটফরম' পার হচ্ছে।

ফুলি যেন মহাভারতের সঞ্জয়ের মতো দূর থেকে সবকিছু দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায়।

আঁখি ভেজানো দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো। পরনে, গাঢ় ইয়লো রঙের সালোয়ার, কামিজ। গত বছর পুজোয় বিশাখা দেবী যখন কলামণ্ডপে যান তখন মেয়ের জন্য দামী একজোড়া পোশাক নিয়ে গিয়েছিলেন। আজ তাই পরে বিশাখা দেবীর সুন্দরী কন্যাটি অপরূপা হয়ে উঠেছে।

দু'চোখ ভরে আঁখির দিকে তাকিয়ে ফুলি মন্তব্য করল, কি যত্তন তোমাকে দেখতে গো দিদি, লক্ষ্মীঠাকরুণটির মতো। চক্ষু ফিরানো যায় না।

একমুখ ঝকঝকে হাসি উপহার পেল ফুলি।

আঁখি বলল, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাক কেন ফুলিদি, ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে আসবে।

বড় করে জিভ বের করল ফুলি। তার আদ্দেকটা দাঁতে কাটল। পরে বলল, ওটি পারবুনি দিদি, মায়ের বারণ। আগে বাইরে থেকে ঠক্‌ঠক্ আবাজ কর। ভেতরের আদেশ এলে ঢোক! তার আগে না।

আঁখি বলল, এটাই নিয়ম, ঠিক বলেছে মা। তবে এবার থেকে আমি ওপরের ঘরে একা যখন থাকব, তুমি সোজা কিছু না বলেই চলে আসবে আমার ঘরে।

মা দেখলে বকবে যে ?

মা যখন বাইরে থাকবে বা নিচের ঘরে তখন তুমি ওপরের ঘর হাট করে খুলে ঢুকে পড়বে।

ফুলি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। মুখে বলল, এখন মা আসবে, নিচে যাই।

চল, আমিও যাচ্ছি।

দরজায় বেল দিতে ফুলি দরজা খুলে দিল।

আঁখি মায়ের দিকে তাকাতেই মা বলল, এরা শুধু আমার কলিগ নয়, আমরা একই পরিবারের মেম্বার।

আঁখি নত হয়ে সকলের পায়ের ধুলো নিল। সকলেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন।

ওদের ভেতর একজনের বয়েস কিছু কম। সাতাশ, আঠাশের বেশী নয়। বেশ সুন্দরীদের পর্যায়ে পড়ে। লাবণ্যে ভরা কাঁচা হলুদ গায়ের রঙ। সারা মুখে খুশীর আভা।

বিশাখা দেবী বয়স্কা দুজন মহিলাকে বললেন, চল আমরা নিচের ঘরে বসে গল্প করি, ঋতুপর্ণা আর আঁখি ওপরে যাক।

ওঁদের ভেতর একজন বললেন, এ বছর আমাদের স্কুলের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব। শিশির মঞ্চে আগামী রবিবার উৎসবের উদ্বোধন-দিবস। সেদিন অনেক ভাষণ ইত্যাদি রয়েছে। শেষে দর্শকদের সামনে পরিবেশন করা হবে একক একটি নাচ। আমাদের সকলের ইচ্ছা সে নাচটা তুমিই নাচবে।

অন্যজন বললেন, এ বছরই তোমার ফিরে আসার কথা ছিল, বিশাখাদি এই অনুষ্ঠানের জন্য তোমাকে একটু আগেভাগে আনালেন।

বিশাখা দেবী আঁখির উদ্দেশ্যে বললেন, ঋতুপর্ণা আমাদের স্কুলের মেয়েদের নাচ শেখায়। গানের গলাটিও সুন্দর। ক্ল্যাসিকাল নাচের বোল ওর মুখে দারুণ শোনায়। তুমি ওর সঙ্গেই প্র্যাকটিস করবে। ওপরে গিয়ে তোমার ঋতুপর্ণাদির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নাও।

ওপরে যেতে যেতে ঋতুপর্ণা বলল, তোমার এ ঘরে ঢোকার আগে অন্তত চারবার আমি ট্রেসপাস করেছি।

একথা বলছেন কেন ঋতুপর্ণাদি, আপনি কোনোরকমেই অনধিকার প্রবেশ করেননি। মায়ের যাঁরা এক পরিবারের লোক তাঁদের অবাধ যাতায়াতের অধিকার আছে এ বাড়িতে। আমি বরং পাঁচ বছর পরে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছি।

ঘরে ঢুকে ঋতুপর্ণা বলল, আমার এতো ভাল লাগে তোমার

এই ওপরের ঘরখানা যে কি বলব। লম্বা-চওড়া ঘর, ধবধব করছে সাদা মেঝে। পূবে সূর্যোদয়ের দৃশ্য, দক্ষিণে কু-ঝিক্-ঝিক্ চলেছে। সত্যি ড্রিমল্যান্ড।

আঁখি বলল, যে হারে শহর এগোচ্ছে এ দৃশ্য আর কতদিন থাকে দেখুন।

যে কদিন পাওয়া যায় তাই লাভ।

আঁখি বলল, ঋতুপর্ণাদি, এই খাটে বসুন।

বসব, একটা শর্তে।

কি শর্ত দিদি?

আমার সঙ্গে আপনি, আজ্ঞে, আসুন, বসুন চলবে না। আর ঐ দিদি ডাকটাই বহাল।

বেশ তাই হবে, এবার তাহলে বস।

খাটের ওপর একবার বসে পড়েই নিচে মেঝেতে নেমে পড়ল ঋতুপর্ণা।

আঃ, এই মেঝেতে বসে যা আরাম না! তুমি ঝটপট নূপুর বেঁধে নাও সুন্দরী, আমি গান ধরি আর বোল তুলি।

আঁখি বলল, তুমি সোলকুট্টু, স্বরযতি, বর্ণম্, পদম্ ইত্যাদি গাইবে তো?

ঋতুপর্ণা গালে হাত দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলল, ও মেয়ে! আমাকে আনাড়ী ভাবা! পরীক্ষা হয়ে যাক।

আঁখি বলল, তোমার পরীক্ষা নেব আমি, হাতের কাছে হার-মোনিয়ম নেই তাই বলছিলাম।

ঋতুপর্ণা খাটের তলায় উঁকি দিয়ে বাক্সসমেত হারমোনিয়ম-খানা টেনে আনতে আনতে বলল, এখনও মেয়ের সড়গড় হয়নি কোন জিনিসটা কোথায় আছে।

স্বীকার করছি দিদি, তুমি এ বাড়ির অনেক কিছুই আমার চেয়ে বেশী জান।

ঋতুপর্ণা বলল, সবে কাল এসেছ এতখানি পথ ট্রেন জার্নি করে, ঘোর কাটতে আরও দু'একদিন লাগবে, তারপর কে কোথায় আছে তার খোঁজ।

পায়ে নূপুর বাঁধতে বাঁধতে আঁখি বলল, তুমি কোথায় নাচ শিখেছ দিদি ?

আমার কথা ছেড়ে দাও। বিয়ের আগে গোবিন্দন পিল্লাই-এর নাচের ইস্কুলে একটু-আধটু শিখতাম, এখন তোমার মায়ের ইস্কুলে নাচগানের তালিম দিই মেয়েদের।

প্রায় দেড়ঘণ্টা প্র্যাকটিস চলল। সুরে তালে বোলে চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দিল ঋতুপর্ণা।

নাচের শেষে বাহবা দিয়ে বলল, হ্যাঁ শিখেছ বটে নাচ। খোদ ভরতনাট্যম্ ঘরানার নিখুঁত শুদ্ধ কাজ। মোহিনী আট্যমে তোমার হিন্দোলিত দেহভঙ্গিমা আর চোখের কাজ অপরূপ। তোমার চাহনিতে যে আমন্ত্রণ তাতে স্বয়ং মহাদেবও টলে যাবেন। পাঁচ বছরে নিজেকে তৈরি করেছ বটে।

আঁখি বলল, দিদি, ওখানকার পুরনো ঘরানার গুরুরা দশ-পনের বছরের আগে ছাত্রছাত্রীদের মঞ্চে উঠতে দেন না। নিয়মের ভীষণ কড়াকড়ি। সাত-আট বছরের ছেলেরা এক একটা ভিলাক্কু জেবলে সিধে হয়ে বসে থাকে। ওরা সব কথাকলির ছাত্র। প্রদীপের হলুদ আলোর দিকে তাকিয়ে ওরা নানারকম চোখমুখের কাজ করতে থাকে। চোখের তারা ডানদিকে পুরো ঘুরছে আবার বাঁ দিকে। কপাল থেকে থুতনি পর্যন্ত দু'ভাগ করে ওরা দু'দিকে দু'রকম ভাব ফোটাতে পারে। চোখ নাক ঠোঁট গালের একদিকে কান্না তো অন্যদিকে হাসি। হরপার্বতীর মিলন দৃশ্য একই মুখে কি অপরূপ করে যে ফোটায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ফুলি এলো চপ, মিষ্টি প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে।

প্লেট রেখে দিয়ে সে বলল, ঋতু দিদিমণি অনেক চপ আছে, ভাল লাগলে আরও দেব। আমি নিচে যাচ্ছি গো দিদি, তুমি হাঁক দিলে আমি নিয়ে আসব।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল ফুলি।

নিজের প্লেট থেকে একটা চপ হাতে তুলল ঋতুপর্ণা। বাঁ হাতে আঁখির থুতনি ধরে মুখখানা উঁচু করে ডান হাতের চপটা ওর মুখে গুঁজে দিয়ে বলল, প্রথম আলাপের স্মৃতি।

আঁখির বারণ না শুনে সব চপটাই একটু একটু করে খাইয়ে দিলে।

আঁখি এবার বলল, আমি তোমাকে প্রথমেই মিষ্টিমুখ করাতে চাই।

ও একটা দরবেশ তুলে ঋতুপর্ণাকে খাইয়ে দিলে।

বেশ কাজু আর কিশমিশ দেওয়া ঘৃতগন্ধী দরবেশ।

মিষ্টি খাবার পর ঋতুপর্ণা বলল, তুমি মেয়ে ভারী চালাক।

একথা কেন দিদি?

তুমি যে বহুমূল্যের একটা জিনিস আমাকে উপহার দিলে তা জিনিসটির গায়েই খোদাই করে দিয়েছ।

সামান্য থমকে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল আঁখি।

ভারী সুন্দর বলেছ, দর-বেশ।

সেদিনের হাসির হাট ভাঙল। কিন্তু এই অল্প সময়ের ভেতরেই বাঁধা পড়ে গেল দুটি মন। অসমবয়সী তবু অন্তরঙ্গ বন্ধন।

চারদিন রিহার্সেল হলো এ বাড়িতে। দুজনের বাঁধন আরও নিবিড় হলো।

অনুষ্ঠানের আসরে ঋতুপর্ণা তার পরিচিত দক্ষিণী বাদকদের একটি দলকে নিয়ে এসেছিল। তারা অনুষ্ঠান শুরু হবার ঘণ্টা দুয়েক আগে এসে আঁখির সঙ্গে একটা রিহার্সেল দিয়ে নিয়েছিল।

এবার মঞ্চে বেজে উঠল, এডাক্কী, মুখবীণা, তিথি আর টপপু মাদ্দলম্।

ধীরে ধীরে পর্দা সরে যেতে দেখা গেল মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিতা নর্তকী। দৃষ্টিনন্দন রূপ ও দেহভঙ্গিমা। বিপরীত মুখে জানু দুটি ভেঙে অর্ধ উপবেশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আঁখি। বুকের ওপর ঈষৎ ব্যবধানে দুটি হাত নমিত। বামে চুড়াবদ্ধ কেশগুচ্ছ রুপোর নেট্রিচুটি দিয়ে বাঁধা। তার নিচে বেল-কুঁড়ির দোসুতি বেষ্টনী। নাকে ঝিকমিক করছে হীরের মুকুতি। কানে দুলছে ঝুমকো। গলায় দুলছে সাতনরী মুক্তোমালা। কণ্ঠ বেষ্টন করে আছে সোনার চিক। হাতে সোনার কাঁকনের সঙ্গে ভুজ-বন্ধনী।

বেজে উঠল সোলকুট্টুর বোল। ঋতুপর্ণার সুললিত কণ্ঠে প্রার্থনার সুর।

আন্দোলিত হতে লাগল আঁখির সুসজ্জিত দেহ। পাদস্বরম্ বেজে উঠল রম্‌ঝম্ শব্দে। বোলের তালে আঁখির সারা দেহ আবর্তিত হতে লাগল। ধীর থেকে মধ্য, মধ্য থেকে দ্রুতলয়ে।

এবার শুরু হলো স্বরযতি। সরগম সাধছে ঋতুপর্ণা, লীলা-ভরে নাচছে আঁখি। নাচতে নাচতে বাড়ছে-কমছে লয়। কটির ঊর্ধ্বে আন্দোলিত হচ্ছে আঁখির সুগঠিত বাহু ও বক্ষদেশ।

স্বরযতি শেষ হলে শুরু হলো বর্ণম্। ঋতুপর্ণার গানের সুরে প্রিয়তমের জন্য প্রেমিকার উদ্বেগাকুল প্রতীক্ষার কাতরতা। চোখে মুখে পদক্ষেপে সেই উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তুলছে আঁখি। অনবদ্য অভিনয়। নয়ন ও মুখ বিভঙ্গে ফুটে উঠছে এই ভাবটি,—সে কি আসে, সে কি আসে।

প্রতিটি দর্শকের ভেতরে সে যেন খুঁজে ফিরছে তার প্রেমিককে। সে যেন আঁখির আমন্ত্রণে বলছে, মহাকালের বন্ধন মুক্ত হয়ে এসো প্রিয়তম আমার আকুল প্রতীক্ষার পথ বেয়ে।

দর্শকেরা ভুলে গেছে তাদের বয়সের কথা। মহাকাল যাদের যৌবনকে হরণ করেছিল, তারাও আজ অনন্ত যৌবনের মোহিনী মায়ায় ফিরে পেয়েছে তাদের লুপ্ত যৌবন।

বর্ণমের পর ক্ষণবিরতি। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত করতালিধ্বনি।

এবার পদম্। সরগম, বোল কিছু নেই। শুধু গানে গানে জানিয়ে যাওয়া মনের আকুতি।

হে প্রিয়তম, আমার এই কান্না, এই আকুলতা কি তোমার কাছে পৌঁছচ্ছে না? আমার জীবন, আমার মরণ যে তোমার সামান্য ইচ্ছার দোলায় দুলছে প্রিয়তম।

নীলাম্বরী রাগের করুণ মূর্ছনা ভেসে চলল সারা প্রেক্ষাগৃহে।

আবার অন্ধকার, আবার করতালিধ্বনি, আবার আলোর ফুটে ওঠা।

এবার আঁখি যেন পেয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিতকে। সে ধরে রাখতে পারছে না তার আনন্দ। তিলানার সপ্ত তালে নাচের মুদ্রায় সে প্রকাশ করে চলেছে তার মনের খুশী। প্রেমিকার রুদ্ধ বেদনা অনুকূল হাওয়ার প্রবাহে বসন্তের পর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়-মিলনের উষ্ণতায়, দেহের কম্পনে, নয়ন বিভঙ্গে, কর-চরণ বিন্যাসে থরে থরে ফুটে উঠছে বসন্তের বর্ণময় অপর্যাপ্ত পুষ্প।

নায়িকা যেন লীলাভরে পালতোলা নৌকোয় নীল সমুদ্রের তরঙ্গ দোলায় দুলতে দুলতে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রেক্ষাগৃহ উল্লাস-ধ্বনি আর করতালিতে মুখরিত হতে লাগল কতক্ষণ।

গ্রীনরুমের ভেতর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে গেলেন। সবার শেষে এলেন দুজন। সম্ভ্রান্ত সুদর্শন যুবক। একজন চব্বিশ-পঁচিশের বেশী নয়, অন্যজন বড়জোর তিরিশ-বত্রিশ।

বড়জন চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সামনের একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতু কই?

ঋতুপর্ণাদি বাঁদিকের উইংসের ভেতর কিছু গোছগাছ করছেন বলে মনে হয়।

নর্তকীটি কোথায়, যিনি অনেকের মাথাই ঘুরিয়ে দিয়েছেন?

ভদ্রলোকের বলার ধরনটা বেশ মজাদার, তাই ক্ষুব্ধ না হয়ে বরং উপভোগ করল মেয়েটি।

সে হেসে বলল, নাচিয়ে আর গাইয়ে দুজনেই এক জায়গায় আছেন।

অনুগ্রহ করে তাঁদের একটু খবর দেবেন কি?

কি বলব?

বলবেন, নর্তকীকে এক গুণমুগ্ধ যুবক সাধুবাদ জানাতে এসেছেন।

অল্পবয়স্ক যুবকটি বয়োজ্যেষ্ঠকে সামান্য ঠেলা দিয়ে বলল, কি হচ্ছে কি!

মেয়েটি ঋতুপর্ণাকে ডাকতে এগিয়ে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল, আপনার নাম?

আমি আপনার ঋতুপর্ণাদির রথের সারথী। বলবেন, ওঁর সারথী অপেক্ষা করছেন।

আপনারা প্লিজ এখানেই একটু অপেক্ষা করুন, আমি ঋতুপর্ণাদিকে ডেকে আনছি।

এই যুবকটির ইচ্ছার কথাটুকুও দয়া করে জানাতে ভুলবেন না।

সামান্য সময়ের ভেতর আঁখির হাত ধরে ঋতুপর্ণা হাজির।

কেমন লাগল আমাদের অনুষ্ঠান?

তোফা। তবে ঐ প্রথম পর্বের একঘেয়ে পোশাকি ঘ্যানর ঘ্যানর-গুলো বাদ দিয়ে।

ওটা মাস্ট। ওটা অনুষ্ঠানের অঙ্গ। শিক্ষা দপ্তরের হোমরা-চোমরাদের ভালবেসে বক্তৃতা দিতে ডেকে আনা হয় না, ইস্কুলের কিছু স্বার্থ থাকে মশাই। তাছাড়া তুমি একজন গায়ক বা নাচিয়েকে আনতে যাও দেখি, মোটা টাকা ছাড়া পাবে না, কিন্তু এই সভাপতি, প্রধান অতিথিদের দেখ, সামান্য একখানা ফুলের মালাতেই সন্তুষ্ট।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, একেবারে মহাদেব। এখন বল, তুমি যে নর্তকীটিকে আগলে রেখেছ তাঁর বাজার দর কত?

অমূল্য। অর্থের বিনিময়ে ওর নাচ দেখা যাবে না, মানুষের ভালবাসার সঙ্গে ওর ইচ্ছাটুকু যোগ হলেই ও নাচবে। হ্যাঁরে পল্লব, আঁখির নাচ কেমন লাগল তোর?

নবীন যুবকটি বলল, কোনো কমপ্লিমেন্টই ওঁর জন্য অতিরিক্ত নয়। প্রফেশনাল নাচিয়েদের সঙ্গে ওঁর অনেক তফাৎ। তাঁদের হাসি, কান্না, বিস্ময়—সবকিছু একটা ছকে বাঁধা তাই অনেক সময় কৃত্রিম বলে মনে হয়, কিন্তু ওঁর এক্সপ্রেশানগুলো এত সজীব আর স্বাভাবিক যে প্রতিটি দর্শকের মনকে মুহূর্তে ছুঁয়ে যাবে।

ঋতুপর্ণা বলল, কি গো আঁখি, আমার ভায়ের সমালোচনায় তুমি খুশী তো?

সলজ্জ হেসে আঁখি বলল, আমি কি বলব দিদি। নিজে তো দর্শকের আসনে বসে নিজের নাচ কখনো দেখিনি।

এবার ঋতুপর্ণা ব্যস্ত হয়ে উঠল, এই দেখ, এখনও ওদের পরিচয়টা দেওয়া হয়নি।

উনি অদ্রিবিজয় দেব, আমার আইনসিদ্ধ পতিদেবতা। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। বৃত্তিতে বাস্তুকার, সরকারী চাকুরে। আর এই যুবকটি আমার একমাত্র ছোটভাই। বাবা-মা দশ বছর আগে আমাদের ছেড়ে চলে যান। এখন ভাই আমার কাছেই থাকে।

থামল ঋতুপর্ণা।

অদ্রিবিজয় বললেন, ইনকমপ্লিট থেকে গেল তোমার পরিচয় পর্ব। আচ্ছা আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি।

আমার এই পরমাত্মীয়টির পুরো নাম পল্লব দত্ত চৌধুরী। এম. বি. বি. এস. তালিকায় এক নম্বরে নাম। এক মাসের ভেতরেই আমেরিকা যাচ্ছে হায়ার স্টাডির জন্য। বছর পাঁচেকের যাত্রা। ফরেন স্কলারশিপ বাগিয়েছে। তোমার মা কোথায় ?

ডেকোরেটার আর বাজনার লোকেদের পেমেন্ট করছেন।

ঋতুপর্ণা বলল, তোমরা দুজন গাড়িতে বস গিয়ে, আমি আর আঁখি এইচ. এমকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের গাড়িতেই ওঁদের লিফ্‌ট্‌ দেব।

দারুণ পছন্দ উভয় পক্ষের। আঁখির অসম্মতি নেই এ বিয়েতে কিন্তু সে নির্বিকার। ভাবটা এই, তোমরা যা করবে মাথা পেতে মেনে নেব।

মনে জেগে উঠলেই সরিয়ে দিচ্ছে স্মৃতির ছেঁড়া পাপড়িগুলো। ট্রেনে তুলে দিয়েও সাহির বলেছিল, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ শেষ রাতের স্মৃতিটুকু মন থেকে মুছে ফেলবে। ভুলো না তোমার শপথ।

আঁখি মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, সে তার কথা রাখবে। কিন্তু তার চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল উপচে গড়িয়ে পড়েছিল।

সাহির তা লক্ষ্য করে বলেছিল, এই চোখের দু'ফোঁটা জলের সঙ্গে আমাকে জড়ানো তোমার স্মৃতিগুলো যেন ঝরে যায়।

সে রাতে ঘুমুতে পারেনি আঁখি। সারারাত জানালার ধারে বসে মরা জ্যোৎস্নার আলোয় কেরালার মাঠ ঘাট নদী পাহাড়কে পেছনে সরে সরে হারিয়ে যেতে দেখেছিল।

সাহিরের স্টেশান মাস্টার মামা ভি. আই. পি কোটার ভাল সিটটি আঁখির নামে শেষমুহূর্তে অ্যালট করেছিলেন। তাছাড়া ট্রাংককলে মেয়ের হাওড়া পৌঁছানোর সম্ভাব্য সময়টাও বিশাখা দেবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

বিয়ের আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। বিশাখা দেবী মেয়েকে নিয়ে প্রায়ই বেরুচ্ছেন অঞ্জলি জুয়েলার্স অথবা দক্ষিণাপনে। বাপের

আদরের একটিমাত্র মেয়ে। তাকে সাজিয়ে দেবেন মনের মতো করে।

মুক্তো সেটিং-এর একটি সোনার মুকুট তৈরি করাচ্ছেন। মুকুটের মাঝে চুনির ফুল। তার ভেতর থেকে একটি হিরে দ্যুতি ছড়াবে।

বিশাখা দেবী তাঁর মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই হিরেটি পেয়েছিলেন। তিনিও তাঁর মেয়ের শিরে আশীর্বাদ জানাবেন ঐ হিরেটি দিয়ে।

বিশাখা দেবী তখন অনেক ছোট। মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে একটা দোতলা বাড়ির ছাদের ওপর। অজস্র মানুষ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে।

দমদম থেকে রানী এলিজাবেথ আসছেন একটি খোলা গাড়িতে। যাবেন গভর্নরস্ প্যালেসে। অপরাহ্নের রোদ এসে পড়েছে সুন্দরী রানীর ওপর। তিনি হাসিমুখে হাত নেড়ে অভিনন্দনের উত্তর দিচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর মাথার মুকুট থেকে ঝলসে উঠল অপূর্ব সাত-রঙা রশ্মি। অনেকদিন অবধি বিশাখা দেবী ভুলতে পারেননি সেই আলোর ছটা।

মা বলেছিলেন, ঐ ছটা মুকুটের মাঝখানে গাঁথা কোহিনুর হিরের ওপর আলো পড়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে।

বিশাখা দেবীর বিয়ের সময় তাঁর মা মুকুট গড়ে না দিলেও একটি হিরে দিয়েছিলেন। সেই হিরে মুকুটের ভেতর সেট করে বিশাখা দেবী তুলে দিলেন মেয়ের মাথায়।

ঋতুপর্ণাও ভায়ের বিয়ের ব্যাপারে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল। আসলে তারই উদ্যোগে আঙুলে গোনা কয়েকটা দিনের ভেতর এই বিয়ের অনুষ্ঠান। পল্লব তো নাচের আসরেই কনেকে দেখে মুগ্ধ। আঁখি বিয়ের ব্যাপারে যেমন অমত প্রকাশ করেনি তেমনি উচ্ছ্বাসও দেখায়নি। এটাকে দু'পক্ষই স্বাভাবিক লজ্জা বলে ধরে নিয়েছিল।

অল্প সময়ের ভেতর আয়োজন, তবু প্রায় ত্রুটিহীন অনুষ্ঠান।

হাতে দিন পনেরো-ষোল সময় তার পরেই পল্লব উড়ে যাবে আমেরিকায়। পাঁচ বছর কঠোর তপস্যায় কাটবে তার সময়। অনন্য মনে তাকে চালিয়ে যেতে হবে অধ্যয়ন। নববধূকে নিয়ে স্বপ্নও দেখা চলবে না, স্বপ্ন দেখবে শুধু পাঠ্য বিষয়ের।

ঋতুপর্ণা বিয়ের বাঁধনটা চেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, তরতাজা ভাইটাকে যদি কোনো বিদেশিনী কব্জা করে নেয় তাহলে সমূহ বিপদ। এখন যত দূরেই যাও আর যতক্ষণই ওড়, সুতোটা ধরা রইল হাতে। তাছাড়া পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস পল্লব। এমন একটা অঘটনের সম্ভাবনা খুবই কম। তবু…।

ফুলশয্যার রাতে শেষ যে ব্যক্তি বরবধূর ঘর থেকে বিদায় নিলেন তিনি গৃহস্বামী অদ্রিবিজয়। বললেন, এমন মিল দুর্লভ। একেবারে আঁখি-পল্লব। আঁখিকে চিরদিনই রক্ষা করে পল্লব। হে পরমাত্মীয়, হে পল্লব, তুমি তোমার আঁখিটিকে সযত্নে রক্ষা কর। ধীরে ধীরে ফোটাও ঐ আঁখি-পদ্মটিকে।

সেদিন স্বামীর কাছে স্বাভাবিক নিয়মে দেহসমর্পণ করতে হয়েছিল আঁখিকে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি প্রতিক্ষণে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। তার মনে হচ্ছিল, এই সাজানো ফুলশয্যার ঘর থেকে একটা যাদু-কার্পেট তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। নিচে শস্যভরা প্রান্তর, ঘন অরণ্য, টিলা পাহাড়, আঁকাবাঁকা নদীরেখা।

ওপর থেকে দেখা গেল পশ্চিমে উদ্বেলিত সফেন সমুদ্র, তার কূল জুড়ে সারি সারি সবুজ নারকেলবীথি। কার্পেটখানা তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল কায়েলের জলে ভেসে থাকা একটা নৌকোয়। আকাশে চাঁদের আলো, নোঙর করা নৌকোর তলায় স্রোতের জলের ছলছলানি। অদূরে ফুটে আছে একরাশ শাপ্‌লা।

বড় চেনা পরিবেশ, খুবই পরিচিত নৌকো। বন্ধ কেবিনটা ঠেলতেই আধো অন্ধকারে দেখা গেল কেউ শুয়ে আছে। সে হাত বাড়িয়ে দিল, অপ্রতিরোধ্য তার আকর্ষণ।

সারারাত স্রোতের দোলায় মৃদুমৃদু দুলতে লাগল নৌকো। অনাস্বাদিতপূর্ব উত্তেজনাময় এক অনুভূতি তাকে আলোড়িত করতে লাগল প্রবলভাবে।

কখন জানালার ভেতর দিয়ে বয়ে এলো ভোরের হাওয়া তা জানতে পারেনি আঁখি। হঠাৎ কারো হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠে বসল সে। সংকোচে গায়ে জড়াতে লাগল বিস্রস্ত বেশবাস। এখন লজ্জায় সে অধোমুখি, একান্ত সংকুচিত।

পল্লব বলল, প্রথম দিকে মিলনের রাতগুলিতে যদি সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে চিন্তা বা লজ্জার কিছু নেই। একটি সন্তানকে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেতে চাই, তারপর আর নয়। ছেলেমেয়ে যেই হোক না কেন, ওকে গড়ে তুলব দুজনের মনের মতো করে।

আঁখি কথাগুলো শুনল কিন্তু নত হয়ে রইল তার চোখ। রাতে খোঁপা থেকে খসে পড়া একটি মথিত গোলাপের বৃন্ত ধরে সে দু'আঙুলে ঘোরাতে লাগল।

কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে পল্লব এবার নরম গলায় বলল, আমার কথাটা কি তোমার মনে ধরল না আঁখি।

সলজ্জ হাসি মুখে ফুটিয়ে অতি মৃদু গলায় আঁখি বলল, আমি জানি না।

পল্লব বলল, আজ থেকে আমরা দেহমনে এক হয়ে গেছি। আমাদের দুজনের ভেতর গোপন তো কিছু থাকতে পারে না আঁখি।

পাখি ডাকছে, দিদি হয়তো এতক্ষণে উঠে পড়েছে, আমি যাই।

নতুন বউকে একমুহূর্ত কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করছিল না পল্লবের। সে আঁখির মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, কাল রাতে আমি আমার প্রিয়াকে কি কিছু আনন্দ দিতে পেরেছি?

আঁখি দু'হাতের পাতায় চোখমুখ আড়াল করল।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ উঠতেই বিছানা থেকে ছিটকে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল আঁখি। ততক্ষণে মাথায় ঘোমটা টানা হয়ে গেছে তার।

অদ্রিবিজয় উঠে আসছিলেন। কাছাকাছি এসেই বাঁ হাতে চোখের একদিক আড়াল করে বললেন, আমি কিন্তু কাউকে দেখছি না, ছাদে যাচ্ছি সূর্যঠাকুর কতটা উঠলেন তাই মেপে দেখতে।

মানুষটি হৃদয়বান এবং মজার। এরই ভেতর আঁখি মানুষটিকে খুব ভাল করে চিনে নিয়েছে।

দাদা, ভেতরে আসুন না,—আঁখি বলল।

জিভ কেটে অদ্রিবিজয় বললেন, একেবারে ফুলশয্যার পরের দিন

কাকভোরে কোনো বিবেকবান ভদ্রলোকের আচমকা বরবধূর ঘরে ঢুকে পড়া অমার্জনীয় অপরাধ। ঐ ডাক্তারটা নাক ডাকিয়ে রাত-জাগার মাসুল গুনছে নাকি ?

আসুন না দাদা।

লক্ষ্মী দিদি, এখন ছাদে যাই, নামবার সময় একবার ঢুকব। তখন অতীত সুখ-স্মৃতিটাকেও একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।

আঁখি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি চাপল। অদ্রিবিজয় দ্রুত পায়ে ছাদে উঠে গেলেন।

ঋতুপর্ণা আঁখিকে কাছে পেয়ে দারুণ খুশী। তার চোখমুখ থেকে প্রতি মুহূর্তে উপচে পড়ছিল আনন্দ। এক-একজনের মুখ দেখলে মনে হয় সে চির আনন্দময়। ঋতুপর্ণাও ঠিক তাই। তার কাজে কর্মে আচরণে একটা খুশীর ভাব খেলা করে। তাকে ক্লাসে ঢুকতে দেখলেই চাপা একটা উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের ভেতর। ঋতুপর্ণার পড়ানোতে নাম আছে। একেবারে নিচের ক্লাস-গুলোই ওকে দেওয়া হয়। বাচ্চাদের ম্যানেজ করা বড় কঠিন কাজ। সারা স্কুলের ভেতর এ কাজটি সবচেয়ে ভালভাবে পারে ঋতুপর্ণা।

ওপর ক্লাসের মেয়েদের নাচগানে তালিম দেওয়াই তার কাজ। ইস্কুলের সকল অনুষ্ঠানে সে-ই মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের যত পরিকল্পনা, যত কাজ, উদ্দীপনা আর উল্লাস।

যাঁরাই বিশাখা দেবীর স্কুলের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁরা সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মেয়েদের নাচগান নাটক আবৃত্তির। এসবের শিক্ষাগুরু ঋতুপর্ণা।

অনুষ্ঠানে ছোট ছোট মেয়েদের নাচ-গান অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ঋতুপর্ণার পরিচালনায়। নানা বর্ণ-গন্ধের ফুলকে ফুটিয়ে তুলে চোখজুড়ানো মালা গাঁথতে ঋতুপর্ণার জুড়ি মেলা ভার।

সেই ঋতুপর্ণা এখন দারুণ খুশীতে ডগমগ। এতকাল পরে তার মনের মতো এক সঙ্গী আর ক্ল্যাসিকাল নাচের কমবয়সী হলেও দক্ষ শিক্ষাগুরু মিলে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ডাক এল নিচ থেকে, পল্লব, তোরা সব নিচে নেমে আয়, জলখাবার তৈরি।

আঁখি স্নান সেরে মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে বসেছে। তার

দু'পাশে দুজন। পল্লব আর অদ্রিবিজয় বাছাই করছে গতরাতে পাওয়া উপহার সামগ্রী।

হঠাৎ একটা বড় প্যাকেট পল্লব টেনে বের করল।

অদ্রিবিজয় বললেন, কাল ভিড়ের ভেতর এক ভদ্রলোক এসে আমার হাতে এই ঢাউস প্যাকেটটা ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। লোকটি বাঙালী নন, দক্ষিণ ভারতীয় বলে মনে হলো। আমি ওঁকে বললাম, নিরামিষ ব্যবস্থা আছে, দয়া করে খেয়ে যাবেন।

উনি ভাঙা বাংলায় বললেন, অবশ্যই।

আমি বুম্‌বাকে ওঁর খাবার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে বলে ভেতরে চলে এলাম।

পল্লব বলল, আমাদের দিক থেকে কোনো দক্ষিণ ভারতীয়কে নেমন্তন্ন করা হয়েছে বলে তো জানি না!

অদ্রিবিজয় বললেন, প্যাকিংটা ভাল করে দেখ তো, কার নাম লেখা আছে।

আঁখি বাক্সটা কাছে টেনে নিয়ে দেখল তার একপাশে একটা কাগজে বাংলা হরফে টাইপ করে লেখা আছে, 'কেরালা কলামণ্ডপের শিল্পী বন্ধুরা'।

আঁখি বলল, কেরালায় আমি যেখানে নাচ শিখতাম, সেখানকার বন্ধুরা পাঠিয়েছে। মা শিবন আঙ্কেলের কাছে নেমন্তন্ন চিঠি পাঠিয়েছিল। সম্ভবত কলকাতায় চাকরি করেন ঐ কেরালাবাসী ভদ্রলোকটি। দেশ থেকে কলকাতায় আসছেন জেনে ওঁরা উপহারটি ওঁরই হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পল্লব বলল, স্ট্রেঞ্জ, তোমাদের নিমন্ত্রণ চিঠিতে বিয়ের দিনের উল্লেখ থাকবে, বউভাতের নয়। উনি বউভাতে এলেন কি করে?

মা পাত্রীপক্ষ থেকে যেসব দূরের আত্মীয় বউভাতে যোগ দেবেন তাঁদের এ বাড়ির ঠিকানাও নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে ইংরাজীতে লিখে দিয়েছিলেন। যাতে তাঁরা দেরি হলেও সিধে বউভাতে যোগ দিতে পারেন। তেমনি একটা নিমন্ত্রণ চিঠি কেরালাতেও চলে গিয়েছিল। যদিও জানতাম, ওঁরা কেউই আসতে পারবেন না এতদূরে।

পল্লব বলল, অনুমান তোমার ঠিক, ব্যাপারটা এভাবেই ঘটেছে।

অদ্রিবিজয় বললেন, অত চুলচেরা বিশ্লেষণের দরকার কি বাপু, যে করেই হোক এসেছেন, সাবাস জানাও। এখন খোল প্যাকেট।

পল্লব খুলতে যাচ্ছিল, অদ্রিবিজয় বললেন, তুমি নয়, যার জিনিস সে খুলবে।

পল্লব কাতর গলায় বলল, আমরা কি এখনও একদেহ, একপ্রাণ হয়ে যাইনি?

ব্যাপারটা অ্যাতো সোজা নয় ব্রাদার। অনেক উত্থান-পতন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এক হওয়া যায়। আঁখি, খুলে দেখাও তোমার কেরলদেশীয় উপহারটি।

প্যাকেট খোলা হলো নববধূর কাঁকন কিনিকিনির শব্দে।

আশ্চর্য! এত সুন্দর আর মূল্যবান একটি উপহার কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

মুহূর্তে সারা ঘর ভরে গেল খাঁটি চন্দনের গন্ধে। ওরা পাঠিয়েছে খাঁটি চন্দন কাঠে তৈরি একটি চুণ্ডন ভাল্লম্। সেই রেসের নৌকোর গায়ে হাতির দাঁতের অতি সুন্দর ডিজাইন। নৌকোর আমরমের দিকটা বেশ উঁচু। হাতির দাঁতের তৈরি ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন গায়ক, যারা ওয়াঞ্জীপাট করে। নৌকোয় বসে আছে সারি সারি দাঁড়ী। তাদের হাতের দাঁড়গুলো সব হাতির দাঁতের।

শুধু মূল্যবান নয়, কাজটি অসাধারণ।

অদ্রিবিজয় বললেন, সবসেরা উপহার, এর কাছে সোনাদানা কিছু নয়।

পল্লব বলল, এ ধরনের বোটরেসের ছবি ক্যালেণ্ডারে দেখেছি।

অদ্রিবিজয় বললেন, পাঁচ বছর তুমি কেরালায় ছিলে আঁখি, এই বোটরেস দেখেছ?

হ্যাঁ দাদা, আলেপ্পিতে এ রেস হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যখন ফসল ওঠে তখন ওনাম উৎসব শুরু হয় কেরালায়। প্রবাসী লোকেরা সে সময় ঘরে ফিরে আসে। নাচগান, ফুলের দোলনায় দোলা, মহল্লায় মহল্লায় মেয়েদের করতালি দিয়ে নাচ, আরও কতরকম আনন্দের অনুষ্ঠান। সেই উৎসবের সব সেরা অনুষ্ঠানটি হলো, এই

বোটরেস। এই রেসের নৌকোগুলোর নাম চুণ্ডন ভাল্লম্। একটু ভিন্নরকমের গড়ন।

পল্লব জানতে চাইল, নৌকোগুলো কি খুব বড় ?

আশি থেকে একশো কুড়ি ফুট পর্যন্ত লম্বা। পেছনে চোদ্দ ফুট পর্যন্ত উঁচু সুদৃশ্য আমরম উঠে গেছে। ওর নিচে বিরাট ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে গায়করা ওয়াঞ্জীপাট করে। কাপড় আর মালা দিয়ে সাজানো হয় পেছনের দিকটা।

অদ্রিবিজয় বললেন, তুমি তো অনেক কিছু জান দেখছি। ওয়াঞ্জীপাটটা কি রকম ?

মনে ছিল, এখন অনেকটা ভুলে গেছি দাদা।

তবু কিছু শোনা যাক্।

আঁখি হাতে তাল দিতে দিতে শুরু করল ঃ

'কুট্টানাড়েম পুঞ্জইলে
কচ্ছু পেন্নে কুইলাল্লে
কুট্টাভেনম্ কুঁডাভেনম্
পুডাভাভেনম্
ও তিত্তিত্তাগা
তিত্তিথেই
তিথেই
তাগদাই তোম্।'

অদ্রিবিজয় সোচ্ছ্বাসে বললেন, সাবাস। তালে সুরে একদম মাৎ করে দিলে।

সবাই এবার হাতে নিয়ে দেখতে লাগল নৌকোটা। হ্যাঁ, দেখার মতোই কাজ বটে।

সবশেষে আঁখি চুণ্ডন ভাল্লমটা হাতে তুলে নাড়াচাড়া করতে লাগল। শালা-ভগ্নীপতি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিক পর্যবেক্ষণ করছিল, কোথায় কিভাবে নৌকোটি রাখলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, ঘরের ইজ্জতও বাড়ে।

হঠাৎ নৌকোটা উল্টে দেখতে গিয়ে একটা বিদ্যুতের শক্ লাগল আঁখির চোখে। চন্দন কাঠের ওপর খোদাই করা ছোট্ট একটি নাম। চোখে সহজে না পড়ার মতো। কিন্তু আঁখির চোখের ওপর ঝলমল

করে উঠল সে নাম।

সাহির!

তাহলে কলামণ্ডপের শিল্পীদের নামের আড়ালে সাহিরই তাকে মনে রেখে পাঠিয়েছে উপহার।

চোখ বেয়ে অঝোর ধারা নামল আঁখির। সে মুখে কাপড় তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

শব্দটা অদ্রিবিজয়ের কানে পোঁছতেই তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। এ কি অভাবনীয় কাণ্ড! আঁখি কাঁদছে। এমন হাসিখুশি মেয়েটার হঠাৎ কান্নার কি হলো!

অদ্রিবিজয় আঁখির পাশে এসে বসলেন। মাথায় হাত রেখে বললেন, কি হলো দিদি?

পল্লবেরও চোখে পড়ল ব্যাপারটা। সে এগিয়ে এলো।

আঁখি মুখে কোনো উত্তর দিল না, সে শুধু মাথা নেড়ে জানাল কিছু না।

অদ্রিবিজয় উঠে দাঁড়িয়ে পল্লবকে ইঙ্গিতে বললেন, বাইরে চল, ওকে একা থাকতে দাও।

দুজনে প্রায় নিঃশব্দে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে অদ্রিবিজয় বললেন, ব্রাদার, মেয়েটার মন নয় তো, একেবারে একতাল নরম মাটি। তোমার মনের মতো করে গড়ে নিতে পারবে।

তা না হয় হলো, কিন্তু দাদা, ওর কান্নার হেতুটা কি?

এই সামান্য কথাটুকু অনুমান করতে পারছ না! উপহারটি হাতে পেয়ে ওর মনে পড়ে যাচ্ছে পাঁচ বছরের স্মৃতি। সেই কিশোরী মেয়েটি গিয়েছিল, ফিরে এলো তরুণী যুবতী হয়ে, এতগুলো ঋতুর স্মৃতি কি ভোলা যায়। তাই কাঁদছে। বড় কোমল মনের মেয়ে রে। রিয়েলি, ইউ আর ভেরী লাকি, ব্রাদার। অবশ্য…।

অদ্রিবিজয়কে থেমে যেতে দেখে পল্লব বলল, থামলেন যে?

অবশ্য তুমি যদি ওর সেন্টিমেন্টকে মূল্য দিয়ে চল তাহলে আখেরে লাভ হবে তোমারই।

যেমন? আর একটু ক্লিয়ার করুন।

ওর পুরো ভালবাসায় ভরা মনটা তুমি দারুণভাবে উপভোগ

করতে পারবে।

আপনি দাদা গুরুদেব, যে পথে চালাবেন সেই পথেই দুটি চোখ বন্ধ করে চলব।

ওটি করো না ব্রাদার, হোঁচট খাবে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিও একটু খোলা রাখতে হয়।

ওরা ফিরে দেখল, আকাশ মেঘমুক্ত, এক মুঠো সোনালী রোদ্দুর ঝিলিক দিচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ওদের দিকে চেয়ে আছে আঁখি।

অদ্রিবিজয় এগিয়ে এসে কপট শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, খোল ঘোমটা। এ বাড়িতে তোমার কোনো শ্বশুর, শাশুড়ি নেই। গুরু-জন বলতে এই বাড়ি তৈরির মিস্ত্রীটি আর তার মাই ডিয়ার একটি বউ। ওদের এতো মান্যিগণ্যি করে মাথার ওপর ঘোমটা তুলতে হবে না।

পল্লব বলল, এ বিষয়ে আমি কি কোনো মন্তব্য করতে পারব না?

একেবারে না। যেখানে স্বয়ং গৃহকর্তা দাঁড়িয়ে সেখানে তার কথাই ফাইনাল।

আঁখি ঘোমটা সরাল, তবে এলো চুলগুলো ঢেকে কাঁধ অব্দি তুলে রাখল শাড়ি।

এবার সে 'আসুন দাদা, দিদি অনেকক্ষণ ডেকেছেন', বলতে বলতে তর্‌তর্‌ করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

ঋতুপর্ণার নির্দেশ মতো কালকের উদ্বৃত্ত চপ ইত্যাদি গরম করছিল রান্নার মেয়েটি। ঋতুপর্ণা নিজে ময়দা মেখে লেচি তৈরি করে রেখেছে, ওরা এলে ওগুলো বেলে ভেজে লুচি তৈরি করে দেবে।

পেছন থেকে এসে বেলুনিতে লেচি নিয়ে বেলতে বসে গেল আঁখি।

ঋতুপর্ণা বলল, তোমার স্নানও সারা হয়ে গেছে দেখছি। লক্ষ্মী মেয়ে। গৌর-নিতাই কোথা গেলেন?

পেছন থেকে অদ্রিবিজয়ের গলা শোনা গেল, এই যে আমরা দুটিতে ডাইনিং টেবিলে এসে বসেছি বিষ্ণুপ্রিয়ে।

এবার লুচি ভাজতে এগিয়ে গেল ঋতুপর্ণা। আঁখি বলল, আমাকে দাও দিদি, আমি ভাজব।

এবার থেকে তুমিই তো ভাজবে, তবে আজ নয়। হাতে মুখে গরম ঘিয়ের ছিটে পড়ে গেলে অষ্টমঙ্গলাতে যখন মায়ের কাছে যাবে তখন বড়দিমণি মেয়েকে দেখে কি বলবেন।

অদ্রিবিজয় চেঁচিয়ে বললেন, অবজেকশান।

কেন, কি হলো ?

অনেক গোলমাল করে বসলে। এতকাল আমাদের প্রচলিত সমাজ-সম্পর্কের একেবারে পিণ্ডি চটকে দিলে।

কি রকম ?

যিনি তোমার সম্পর্কে মা, মাসিমা অথবা মাউইমা হলেন, তাঁকে বলছ 'বড়দিমণি' !

ওটা বহুদিনের অভ্যেস স্যার, ওটি ছাড়তে সরম লাগবে।

অদ্রিবিজয় বললেন, লজ্জা নারীর ভূষণ ঠিক তবে এ বিষয়ে 'নো কম্প্রোমাইজ'। সমাজ-ব্যবস্থাপকেরা তোমাকে কোনোভাবেই ক্ষমা করবেন না।

ঋতুপর্ণা বলল, কদিন ধরে আমার মনের ভেতরে এ ব্যাপারটা নিয়ে একটা খচখচানি চলছে।

অদ্রিবিজয় বললেন, একটা কাজ কর। কিছুকাল দুটো সত্তা হোক তোমার। একটা কর্মস্থলে, অন্যটা বাইরে। যখন স্কুলে থাকবে তখন সবার সামনে একান্ত প্রয়োজনে দু'একবার বড়দিমণি ডাকতে পার। বাইরে এলে অথবা ওঁর বাড়ি গেলে মাসিমা বলেই ডেকো। এই যেমন, 'মাসিমা, আমি বাড়ি ফিরেই আঁখিকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও কদিন ধরেই বলছে, মায়ের হাতের তৈরি হিঙের কচুরি খেয়ে আসব।'

আঁখি প্লেটে খাবার সাজাচ্ছিল, সে বলল, ইস্ আমি হিঙের গন্ধ একেবারেই সইতে পারি না।

অদ্রিবিজয় মাথায় হাত দিয়ে বললেন, অ্যাই সেরেছে। এ বাড়িটা যে অনেকদিন থেকেই হিংলাজ ম্যাডাম, এখন কি করি।

খাবারের দুটো প্লেট টেবিলে রেখে দিয়ে আঁখি বলল, হিংলাজ তো একটি তীর্থ বলেই জানি।

হ্যাঁ, ঠিকই জান। আমার এই হিংলাজ তীর্থে দুটি কাক আছে, যাকে তীর্থের কাক বলে। তাদের একটি হিংয়ের ভক্ত, অন্যটি লাজের। অর্থাৎ দুটো মিলে হিংলাজ।

আরও একটু সহজ করে বুঝিয়ে দিন দাদা।

এই আমি হলাম, 'হিং' দেওয়া খাদ্যের পরম ভক্ত, আর তোমার দিদি 'লাজ' অর্থাৎ খই দিয়ে তৈরি মোয়ার একান্ত অনুরাগিণী। ঘরে খুঁজলে এখনও জয়নগরের মোয়ার দু'একটা খালি প্যাকেট দেখতে পাবে।

নাকের কাছে একটা আঙুল ঠেকিয়ে আঁখি বলল, ধীরে ধীরে দুটোই অভ্যেস করে নেব।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

অদ্রিবিজয় বললেন, না ভগ্নী, তোমাকে বাড়িতে নিয়ে এসে এত কষ্টের ভেতর ফেলব না। বরং যেদিন হিং খেতে ইচ্ছে হবে সেদিন তোমাকে মাতৃসদনে পাঠিয়ে দিব।

॥ চার ॥

হাতে সময় অতি অল্প তবু নব বরবধূ হানিমুনে যাবে না, এ কেমন কথা। অতএব পরামর্শ সভা বসল।

অদ্রিবিজয় হিসেবপত্র করে বললেন, যাওয়া-আসা এবং থাকা নিয়ে আট দিনের বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

শালা-ভগ্নীপতি মিলে কথা হচ্ছিল। পাশে বসে নীরব দুজন শ্রোতা, আঁখি আর ঋতুপর্ণা।

পল্লব বলল, তাই সই। আমি একটা কথা ভাবছি।

বল ?

একটু দূরে হলেও আমার এক বন্ধু রয়েছে সেখানে। বন্ধুর মতো মিশি কিন্তু তাপসদা আমার এক বছরের সিনিয়ার। এই মাস তিনেক আগে এসেও আমাকে অনেক করে ডেকে গেছে তার কাছে যাবার জন্য। সদ্য বিয়ে করা বউও তার সঙ্গে সেখানে আছে।

অদ্রিবিজয় বললেন, বউ তার সঙ্গে থাকবে না তো কি, হাটে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াবে!

না, কথাটা বলছি এজন্যে যে, বন্ধু থাকে অতি দুর্গম আর নির্জন এক পাহাড়ী এলাকায়, যেটি রামকৃষ্ণ মিশনেরই একটি শাখা সেবাকেন্দ্র। সেখানে সে সেবাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। তার স্ত্রী নার্সিং কাম বোটানির রিসার্চ নিয়ে মেতে আছে।

তা বেশ, জায়গাটা কোথায় বলবে তো?

শ্যামলাতাল।

শুনেছি নামটা। কলেজে পড়ার সময় আলমোড়া গিয়েছিলাম, সেখানে মায়াবতী আর শ্যামলাতালের নাম শুনি। যাওয়া হয়নি মিশনের ঐ জায়গাগুলোতে। কিন্তু ব্রাদার, ওটি তো হানিমুনে যাবার জায়গা নয়।

পল্লব বলল, ওখানে তাপসদা ও বৌদির জন্য আলাদা কোয়ার্টার রয়েছে। তাছাড়া থাকব তো দিন তিনেক মাত্র। বিবাহিত জীবনের শুরুতে পবিত্র জায়গায় গিয়ে একটু প্রার্থনা করে আসা যাবে।

অদ্রিবিজয় বললেন, হাউসের সকলের সম্মতি আছে তো এ ব্যাপারে? অতি সামান্য হলেও একটু হাত তুলে দেখাও।

প্রথমেই বড় করে হাত তুলল আঁখি।

ঋতুপর্ণা বলল, আমাদের আর কারু সম্মতি জানাবার দরকার আছে কি?

অদ্রিবিজয় বললেন, কোনো প্রয়োজন নেই।

টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

দুন এক্সপ্রেসে পল্লবরা এলো লক্ষ্ণৌ। সেই রাতেই ওরা ধরল নৈনিতাল এক্সপ্রেস। ভোররাতে পিলভিতে গাড়ি বদল করে সকাল সাতটায় ওরা এসে পৌঁছল চল্লিশ মাইল দূরে টনকপুর স্টেশানে।

আশ্চর্য! স্টেশান থেকে বেরিয়েই দেখা হয়ে গেল ডাঃ তাপস সরকার আর শ্রীমতী নন্দিতা সরকারের সঙ্গে।

তাপস সোচ্ছ্বাসে বলল, তুই রাসকেল এলি তাহলে!

নন্দিতা এসে আঁখির হাত ধরল।

তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি পল্লবের। আর্জেন্ট একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল দু'দিন আগে। ভাবতেই পারেনি, এত দূর

দুর্গম জায়গায় টেলিগ্রাম যথাসময়ে পৌঁছে যাবে।

পল্লব বলল, কখন পেলে টেলিগ্রাম ?

কাল সন্ধ্যায়। আমাদের আশ্রমের এক সাধুমহারাজ বিশেষ কাজে কাল বাইরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে পোস্ট অফিস হয়ে আসার সময় তোর টেলিগ্রাম নিয়ে আসেন। আয় জিপে ওঠ।

শুনেছি সুখীডাং থেকে আশ্রম পর্যন্ত তিন মাইল পথ পাহাড়ের গায়ে সরু রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে হয়।

কথাটা ঠিক। তবে একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছে, যেটার ওপর বড় বড় বোল্ডার ফেলা হয়েছে। ওটা গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত হতে আরও ক'বছর লাগবে তা ঈশ্বরই জানেন।

জিপে উঠে বসতেই ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। পনের মাইল পথ পেরিয়ে গাড়ি এল সুখীডাং।

তাপস বলল, এটা আশ্রমের জিপ। কালেভদ্রে বিশেষ প্রয়োজনে ঐ বোল্ডারের ওপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে চালিয়ে আনা হয়। তোমরা ইচ্ছে করলে জিপে যেতে পার নয়তো হেঁটে। জিপে গেলে যে নাচন শুরু হবে তাতে গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে।

তবে হেঁটে যাওয়া যাক।

তাপস বলল, ড্রাইভার একা যাক জিপ নিয়ে, আমরা এটুকু পথ হেঁটেই যাই চল। তোর শ্রীমতীর কষ্ট হবে না তো ?

ওকে আঁখি বলে ডাকবে। না, না, ওর কোনো কষ্ট হবার কথা নয়, কারণ ছোটবেলা থেকেই ও দারুণভাবে পায়ের এক্সারসাইজ করে এসেছে।

সে কি রে ?

হাঁ, ছোটবেলা থেকেই ও ক্লাসিকাল নাচের শিল্পী। শেষ পাঁচ বছর ও ছিল কেরালা কলামণ্ডপে।

নন্দিতা বলল, দারুণ গুণের মেয়ে তো তুমি !

তাপস বলল, ভয় হচ্ছিল, তোর নতুন বউ হাঁটতে পারবে কিনা। কিন্তু এখন দেখছি ও যাবে আমাদের সকলের আগে আগে।

আঁখি বলল, এমন সুন্দর গাছের ছায়ার আলপনা আঁকা পথ দিয়ে যে কেউ আনন্দে হেঁটে যাবে।

ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এগোতে

লাগল। নিচে বিস্তৃত উপত্যকা। ধাপে ধাপে চাষের জমি নেমে গেছে। দূরে-কাছে দু'দশখানা বিচ্ছিন্ন ঘরবাড়ি। দু'পাঁচটা শাল-গাছ ছাড়া বাকি বেশির ভাগই চিরপাইন। ঝাউ গাছের মতো সরু সূচালো পাতার ভেতর দিয়ে হাওয়া বইছে। চমৎকার ঝিরিঝিরি একটা শব্দ উঠছে। কোনো একটা গাছের ফাঁকে পাখি ডাকল! চুঁইচুঁই চুট্ আওয়াজ তুলে একঝাঁক চিড়িপাখি ফুরুৎ ফুরুৎ পাখা টেনে নিচের ক্ষেত লক্ষ্য করে উড়ে গেল।

একটা বড় তাল বা সরোবর, তার কাছাকাছি আরও তিনটে ছোট তাল সবুজ বনানীতে ঘেরা। তাই স্বামী বিরজানন্দজী এর নাম রেখেছিলেন শ্যামলাতাল।

তাপস গল্প করছিল আশ্রমের। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিরজানন্দজী হিমালয়ের কোলে নির্জন সাধন-ভজনের সুবিধার জন্য এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের পরম ভক্ত মাদার সেভিয়ার। মায়াবতী আশ্রমটিও সেভিয়ার দম্পতির দানে গড়ে উঠেছিল। মায়ের মতো স্নেহশীলা এই মহিলা শ্যামলাতাল আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে আশ্রমটির নাম হয়, বিবেকানন্দ আশ্রম।

পল্লব জানতে চাইল, এখানে হসপিট্যালটি কবে খোলা হয়?

উনিশশো পনেরোতে। বহু মাইল বিস্তৃত এলাকায় এই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমই একমাত্র চিকিৎসাকেন্দ্র। রোগীর চিকিৎসার সব খরচ সেবাশ্রমই যোগায়।

কথা বলতে বলতে একসময় ওরা আশ্রমের এলাকায় পেঁছিল।

বড় বড় গাছের ভেতর শাল, চির, ইউক্যালিপটাস আশ্রমটিকে প্রশান্ত গাম্ভীর্য দান করেছে। তাছাড়া ফলকর কয়েক রকম গাছও রয়েছে ওখানে। অজস্র ফুলের সমারোহ আশ্রমটিকে যেন নন্দন-কাননে পরিণত করেছে।

আশ্রমটির একদিকে দোতলা অতিথি ভবন। সেখানে পল্লবদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাপসদের সঙ্গে একই কোয়ার্টারে থাকা পছন্দ করল। হাসপাতালের সময়টুকু বাদ দিয়ে দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময় ওরা চারজন একসঙ্গে গল্পগুজব আর

ঘোরাঘুরিতে কাটিয়ে দিতে চায়।

আশ্রমের প্রভাতী অনুষ্ঠানগুলি শেষ করে ওরা পাহাড়ের পথ ধরে কিছুটা ওপরে উঠল।

তাপস বলল, এখন আমরা সমুদ্রতল থেকে পাঁচ হাজার ফিট ওপরে রয়েছি। উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখ, হিমালয়ের সারি সারি তুষারশৃঙ্গ।

আঁখি বলল, অপূর্ব। সূর্যের আলো পড়ে কি সুন্দর কাঁচা সোনার মতো ঝলমল করছে।

দক্ষিণে শারদা নদী। ওকে বলে কালী নদী। দিগন্তছোঁয়া শারদা ভ্যালির ওপর দিয়ে ছড়িয়ে বয়ে গেছে নদীটা। একদিকে নেপালের সীমানা, অন্যদিকে ভারতের।

নেপালটা তাহলে কোনদিকে হলো ?—আঁখি জানতে চায়।

নন্দিতা বলল, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, তাই না ?

তাপস আঙুল তুলে নেপালের অবস্থানটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, একেবারে ঠিক।

আশ্রমের আরোগ্যসদনে বহুদূর উপত্যকা থেকে বহু কষ্ট করে রোগীরা আসে। পল্লব এই দু'তিন দিন বন্ধুর কাজে হাত বাড়িয়ে দিল। সে সময়টুকু আঁখিকে নিয়ে নন্দিতা কাটাতে লাগল আশ্রম লাইব্রেরিতে। তারপর ইচ্ছামতো আশ্রম পরিবেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল দু'বন্ধু।

নন্দিতা তার অভিজ্ঞতার গল্প করে চলে। বাঘ আর ভালুকের গল্প। আঁখি অবাক হয়ে শোনে।

নন্দিতা হাত দেখিয়ে বলে, ঐ যে উপত্যকার শেষে একটা জঙ্গল দেখছ, তার একটু নিচে বাঁদিকে কয়েকঘর পাহাড়ীর বাস।

আঁখি বলল, ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে ওখানেই একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল।

আঁখি কৌতূহলী হয়ে বলল, কি এমন ঘটনা নন্দিতাদি ?

ঐ পাহাড়ী গ্রামের একটি মেয়ে সন্তানসম্ভবা ছিল। সে মাঝে মাঝে তার স্বামীর সঙ্গে এসে আরোগ্যসদনে তোমার তাপসদার পরামর্শ নিয়ে যেত। ডাক্তারই বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে পাহাড়ী মানুষ-গুলোর ভেতর সচেতনতা জাগাবার চেষ্টা করত।

মেয়েটিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যেন ভারী কাজকর্ম না করে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। মেয়েটি কদিন ধরে তার স্বামীকে নাকি বলেছিল, রান্নার কাঠ ফুরিয়ে আসছে, জঙ্গল থেকে কাঠ এনে দাও। ডাক্তারবাবু বারণ না করলে আমি নিজে গিয়ে কাঠ কেটে আনতাম।

ক্ষেতির কাজ চলছিল তখন জোর কদমে। লোকটি কিছুতেই সময় করে উঠতে পারেনি। মেয়েটি রাগ করে এক বিকেলে কুড়ুল আর দড়ি নিয়ে কাঠ কেটে আনতে গেল।

সবে গাছে একটা কোপ বসিয়েছে কি বসায়নি, চিতাটা লাফ দিলে জঙ্গলের ভেতর থেকে।

ধন্যি মেয়ে বটে, সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত বাঘটার গলা লক্ষ্য করে কুড়ুল চালাল।

বাঘটা আঘাত পেয়েও ভীষণ বেগে এসে পড়ল মেয়েটির ওপর। একটা থাবার আঁচড় পড়ল ওর পেটে। তারপর গলার নলীতে চোট-লাগা বাঘটা গড়াতে গড়াতে জঙ্গলের ধারে গিয়ে শেষ হয়ে গেল।

আঁখি বলল, মেয়েটি?

আমরা হলে বাঘের ঐ এক ঘায়েই শেষ হয়ে যেতাম, কিন্তু ও রক্তাক্ত দেহটাকে টানতে টানতে এনে ফেলেছিল ওর ঘরের দোরগোড়া অব্দি। ওখানেই ও ঢলে পড়ে। মৃত বাচ্চাটা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে।

হৈ হৈ করে ওরা যখন মেয়েটাকে হাসপাতালে এনে তুলল তখন সব শেষ।

আঁখি বলল, সত্যি, ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক। তবে মেয়েটির সাহস আর প্রাণশক্তিকে বলিহারি দিতে হয়।

নন্দিতা বলল, আর একটি মজার কাহিনী শোন।

বিকেলে পাঁচটা নাগাদ আরোগ্যসদনের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি আর তোমার তাপসদা বেড়াতে যাই। কোয়ার্টার থেকে আমি হসপিট্যালে যাই, তারপর একসঙ্গে দুজনে বেরোই।

সেদিন কোয়ার্টারের কাজে আমার অনেকখানি দেরি হয়ে গিয়েছিল। সাড়ে ছ'টারও পরে আমি আরোগ্যসদনের দিকে যাই।

একটু ওপরে হসপিট্যাল। তুমি দেখেছ, কাঠের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে আরোগ্যসদনের বারান্দায় উঠতে হয়।

আমি নিচ থেকে দেখলাম, তালাচাবি পড়ে গেছে সব ঘরে। ও এতক্ষণে তাহলে একাই চলে গেছে আমাদের নির্দিষ্ট বসার জায়গায়।

কিন্তু ও কে বসে আছে ওর ঘরের সামনে! তালা বন্ধ তবু লোকটা বসে আছে। জ্বরে জবুথবু বলে মনে হলো। কালো একটা কম্বল মুড়িসুড়ি দিয়ে ধুঁকছে।

আজ আর ডাক্তারখানা খুলবে না, এটা ওকে বুঝিয়ে বলে দেওয়া দরকার। এদিকে দ্রুত সন্ধ্যা নামছে, লোকটা এতখানি পাহাড়ী পথ অন্ধকারে পেরিয়ে গ্রামে ফিরবে কি করে।

আমি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে বললাম, আজ আর হবে না, কাল সকালে এসো।

লোকটা নড়ল না। বুড়োথুড়ো হবে, বোধহয় কম শোনে কানে।

আমি সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে এগিয়ে যেতে যেতে একটু চেঁচিয়ে বললাম, আজ নয়, কাল এসো…।

লোকটা অত্যন্ত অসুস্থ বলে মনে হলো। সে আবছা অন্ধকারে ঘষটাতে ঘষটাতে বারান্দার ধারে গিয়ে একেবারে লাফ দিয়ে নিচে পড়ল।

কি কর, কি কর, বলে আমি বারান্দার একটা খুঁটি ধরে নিচে ঝুঁকে দেখলাম। মুহূর্তে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। আশ্রমে সন্ধ্যার বাতি ততক্ষণে জ্বলে গেছে। আমি রাস্তার আলোয় দেখলাম, দ্রুত পায়ে সে পাহাড় বেয়ে নিচে নামছে। একটা মস্ত বড় কালো ভালুক।

আঁখি চোখ কপালে তুলে বলল, ওরেব্বাস্!

নিচে নেমে আসার আগের দিন কোয়ার্টারে বসে জিনিসপত্র গোছগাছ করছিল আঁখি। পাশে বসে নন্দিতা দুঃখ প্রকাশ করছিল, এমন আসার চেয়ে না আসাই ভাল ছিল। তোমরা চলে গেলে মনে হবে, সত্যিই কি তোমরা এসেছিলে!

আঁখি বলছিল, এটা তো দেবলোক, দেখো আবার একদিন

এখানে এসে যাব।

বাইরে কে যেন চেঁচিয়ে কাউকে কিছু বলছিল। আঁখি আর নন্দিতা বেরিয়ে এলো বাইরে।

অতিথি ভবনের পাশে দাঁড়িয়ে পল্লব কাউকে কিছু বলছে বলে মনে হলো। ওরা দুজনে নেমে গেল পল্লবের কাছে।

নন্দিতা বলল, কি হলো ?

পল্লব একটু দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে দেখ ওরা যাচ্ছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সরু রাস্তার ওপর দিয়ে একটা বারো-তেরো বছরের মেয়ে সাত আট বছরের একটা ছেলেকে পিঠে নিয়ে নামছিল।

আঁখি বলল, তুমি ওকে চেঁচিয়ে কি বলছিলে ?

কিছু আগে ঐ ভ্যালির ওপার থেকে মেয়েটা তার ভাইকে পিঠে বয়ে এনেছিল এই হাসপাতালে। গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মচকে গেছে ছেলেটার পা। তাকে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে দিদিকে বলেছিলাম, তুমি আসার সময় মাঝে মাঝে নিশ্চয় ওকে পিঠ থেকে নামিয়ে দম নিয়ে এসেছ।

ও মাথা নেড়ে বলেছিল, কথাটা ঠিক।

এবার তুমি কিন্তু ওকে নামাতে পারবে না, বড়দের ডেকে আন, ওরা বয়ে নিয়ে যাবে।

ও কিন্তু কোনো কথা শুনল না। আশ্রমের কার কাছ থেকে যেন একটা মোটা কাছি চেয়ে এনে পাহাড়ী মালবাহকের মতো ভাইটাকে বাঁধল। তারপর দড়ির একটা অংশ কপালে বেঁধে তুলে নিয়ে চলল, ঐ যাচ্ছে দেখ। আমি ডাক্তার মানুষ, আমারই বুক কাঁপছে।

নন্দিতা বলল, তুমি জান না পল্লব, কি অসাধারণ বুক, পা আর কোমরের জোর ওদের। পাহাড়ে ওঠা-নামাটা ওদের কাছে কিছুই নয়। বিশেষ করে ঐ যে কাছিটা দিয়ে ও ভাইকে বেঁধেছে, আর ওর বসার দরকার হবে না।

পল্লব বলল, এই দু'তিন দিন মাত্র ওদের দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। তাপসের কাছে শুনলাম, ওরা অপারেশনের যন্ত্রণা দম বন্ধ করে সইবে তবু অ্যানাস্থেসিয়া নিয়ে অজ্ঞান হতে চাইবে না।

এই শান্ত নির্জন পরিবেশে অক্লান্ত সেবাকর্মের ভেতর চারদিন কাটিয়ে ওরা ফিরে এলো কলকাতা। প্রাণে আশ্চর্য প্রশান্তি আর আনন্দ।

ট্রেনে আসতে আসতে পল্লব বলেছিল, এই সরল দরিদ্র পাহাড়ী মানুষগুলোর সেবা করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারার মতো শান্তি আর আনন্দ কোথাও নেই।

আঁখি বলেছিল, আমিও চাই না আমার স্বামী দু'হাত ভরে শুধু টাকা রোজগার করুক।

পল্লব দারুণ খুশীতে আঁখির দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, হাতে হাত মেলাও।

আঁখি বলেছিল, আমরা আবার শ্যামলাতালে আসব।

আমারও তাই ইচ্ছে।

॥ পাঁচ ॥

কদিন ধরে আঁখি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে আছে। নিরুদ্যম, মনমরা।

সবাই ভাবছে, এই কদিন বিয়ে হতে না হতেই বর চলল বিদেশে, এতে নতুন বউয়ের মুখের হাসি তো মিলিয়ে যাবারই কথা।

আঁখি কিন্তু ভিন্ন একটি কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সে কি সন্তানসম্ভবা হতে চলেছে! ফুলশয্যার কদিন পরেই ছিল তার ডেট, কিন্তু পেরিয়ে যাবার পরেও কেটে গেল কয়েকটা দিন। তাহলে নতুন অতিথি আসার নিশ্চয়তা বাড়ছে। পল্লব তো তাই চায়। কিন্তু মনের ভেতর একটা অপরাধবোধ হঠাৎ করে যেন মাথা তুলছে। একটা মানুষ সংসার থেকে চলে যাচ্ছে চিরদিনের মতো, তাই তার অপূর্ণ একটা বাসনাকে একটি রাতের সঙ্গ দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিল সে। সেই বিয়ে বিয়ে খেলা। যুবকটি কিন্তু কোনোভাবেই তাকে প্রলুব্ধ করেনি। সে-ই বরং বন্ধুত্বের আবেগ বশে ঐ রাতে তাকে কাছে টেনেছিল, কোনোভাবেই কামনায়

জর্জরিত হয়ে নয়।

বিয়ের পর সে চেয়েছিল তার এ মাসের ডেটটি স্বাভাবিকভাবে পার হয়ে যাক্ কিন্তু তা হলো না। তাই মনে দারুণ সংশয় রয়ে গেল, যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সে কার? অবশ্য আরও একটি মাস দেখবে সে একেবারে নিশ্চিত হবার জন্য।

পল্লবের যাত্রার আগের রাতে তার হাতখানা বুকে টেনে নিয়ে আঁখি বলল, কেউ আসবে বলে মনে হয়।

তুমি ঠিক বুঝেছ?

কদিন ডেট পেরিয়ে গেছে।

পল্লব আঁখিকে আদরে সোহাগে ভরে দিয়ে বলল, একেবারে সিওর হয়ে নাও। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর, তারপর আমাকে সুখবরটা দিও।

প্রথমেই তোমাকে জানালাম। একেবারে নিশ্চিত হয়ে আবার তোমাকেই জানাব। আমার কেমন ভয় করছে।

ভয়ের কিছুই নেই।

আমি কেরালায় একটি অসুস্থ ছেলেকে দেখেছি, তাই ভয় করে। একটি ছেলের পেশী শুকিয়ে যাচ্ছিল, সে নাকি অবশ্যই মারা যাবে। তাকে ওষুধে বাঁচান যাবে না।

ও মাইওপ্যাথি।

বাবার ঐ রোগ থাকলে সন্তানের হতে পারে?

ওটা বংশগত রোগ, তবে বাবার থেকে ও রোগটা আসে না। মামা, তার মামা, এমনি মাতুল বংশধারা থেকে আসে।

সাধারণত কোন বয়সে রোগটা ধরা পড়ে?

ছেলেবেলায়। তুমি এসব কথা নিয়ে মনের ভেতর একেবারেই নাড়াচাড়া করবে না। আনন্দে থাক। আমাকে চিঠি দিয়ে সব জানাবে। যে কোনো প্রবলেমে পড়লেই দিদির পরামর্শ নেবে।

জান, দিদি আমাকে মায়ের মতো আগলে রাখে।

যত দিন যাবে তত বুঝবে আমার দিদি কোন্ ধাতুতে গড়া।

আচ্ছা, একটা কথা বলবে?

বল?

দিদির তো বেশ কয়েক বছর বিয়ে হয়েছে…।

ছেলেপুলে হয়নি কেন, এই তো ?

হ্যাঁ।

হবে না, কারণ জেনে কিছু লাভ নেই।

দাদা কিন্তু দারুণ মজার মানুষ, কথায় কথায় রসিকতা। এত বড় একজন অফিসার বোঝাই যায় না।

অদ্রিবিজয় দেব, লাখে একটি পাওয়াও ভার। তুমি এই সব মানুষজনের ভেতরে থেকে বুঝতেই পারবে না তোমার কোনো অভাব বা দুঃখ আছে।

আঁখি অন্ধকারে পল্লবের একখানা হাত জড়িয়ে ধরে বলল, এমন অভাবও আছে যা বিশেষ একটি মানুষ ছাড়া পূর্ণ করতে পারে না।

পল্লব শেষ রাতেও আঁখিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি যত দূরেই থাকি না কেন, সে অভাব আমাকেও একটি বিশেষ মুখের কথা মনে করিয়ে দেবে।

পল্লব চলে গেলে অদ্রিবিজয় কয়েকদিনের জন্য আঁখিকে তার মায়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

দিদিকে পেয়ে ফুলির মনে খুশীর জোয়ার। সে মনের মতো জলখাবার তৈরি করে দিদির হাতে তুলে দিয়ে বলে, এসব এখন তোমার মুখে রুচবে না দিদি।

একথা বলছ কেন ফুলিদি, তুমি তো জান তোমার হাতের খাবার আমার কত ভাল লাগে।

এবার ফুলির অন্য কথা, জামাইবাবুটি তোমার মনের মতন হয়েছেন তো ?

মনে তো হচ্ছে, তবে ক'টা দিনই বা কাটালাম মানুষটার সঙ্গে! একটু বেশি মেলামেশা হলে বোঝা যায়।

ফুলি বলল, আমার দিদি না, বরকে বশে রাখার একটা তুক্ জানে।

কিরকম ? শেকড়-বাকড় খাইয়ে নাকি ?

না দিদি, ওসব নয়, সিরেফ কিল।

স্রেফ কিল! সে আবার কী!

ফুলশয্যির রেতে জামাইবাবুর বুকে দুটো কিল কষিয়ে

দিয়েছিল, সেই থেকে জামাইবাবু দিদির একেবারে বাধ্য।

হাসি চেপে আঁখি বলল, তুমি তোমার বরকে মারতে পারলে না?

ও রকমটা করতে পারিনি বলেই তো আজ আমার এই দুর্দশা দিদি। ওকে গাঁজার পয়সা যোগাতে পারিনি তাই ঠেঙিয়ে বিদেয় করেছে। আমিও ঐ ঠ্যাঙাড়ে গেঁজেলের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছি।

স্কুল ছুটির পর প্রায় প্রতিদিনই বিশাখা দেবীর সঙ্গে আসে ঋতুপর্ণা। খানিক রাত অব্দি গল্প করে যায়। অদ্রিবিজয় অফিস থেকেই চলে যান ছেলেবেলার এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধু বিয়ে করেনি। অফিসের এক বিহারী পিয়নকে কাছে রেখেছে। সে-ই সংসারের কাণ্ডারী। অদ্রিবিজয় ওখানেই জলযোগ সেরে আটটা অব্দি টেবিল টেনিস খেলেন। তারপর গৃহপ্রবেশ।

দ্বিতীয় মাসের পর খবরটা পেল সবাই। আনন্দের একটা হিল্লোল বইল দু'বাড়িতে।

ঋতুপর্ণা ভাইকে লিখল, 'তুই যখন আসবি, তখন তোকে অভ্যর্থনা জানান হবে একটা ডল পুতুল দিয়ে। সে পুতুলটা দম না দিলেও তোর চারদিকে ছুটে বেড়াবে।'

ঋতুপর্ণার চিঠির ভেতরে একছত্র লিখে দিল অদ্রিবিজয়,—'বিশ্বকর্মা, সাবাস তোমার কেরামতি!'

সবার আগে অবশ্য আঁখির চিঠিতেই আগন্তুক সম্বন্ধে কনফার্ম হয়েছিল পল্লব।

আঁখি লিখেছিল, 'পৃথিবীতে আর একটি মানবসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কোন অপরিচয়ের জগৎ থেকে সে ভেসে আসছে, কে জানে।'

অদ্ভুত এক মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নিল আঁখির এই চিঠি। পল্লব কিন্তু ঐ দুটি ছত্রের উল্লেখ করে আঁখির দার্শনিক দৃষ্টি ও তার প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা করেছিল।

যত দিন যেতে লাগল আঁখির উদ্বেগ বেড়ে চলল। নির্জনে বসে থাকলে সে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে, আমার মনের অস্থিরতা দূর কর প্রভু, সত্যকে—তা যত কঠিনই হোক, মেনে নেবার শক্তি দিও।

প্রার্থনা করতে গেলে চোখ উপচে জলের ধারা বইত।

তার প্রায়ই মনে হতো, সাহিরকে আবেগের তাড়নায় দেহ দান করে সে কী প্রচণ্ড কোনো ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। অপরাধ যদি কারু হয়ে থাকে তাহলে আর কারু নয়, সে-ই একমাত্র তার জন্য দায়ী।

প্রতিদিন এসব যন্ত্রণাদায়ক কথা ভাবতে ভাবতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল আঁখি। তার শরীরে সেই ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়ে উঠল। আজকাল আঁখির হাসি কেমন ম্লান দেখায়। গলার স্বরে আগের মতো প্রফুল্লতার ছোঁয়া নেই।

ঋতুপর্ণা লক্ষ্য করেছে ওর পরিবর্তন আর ভাবান্তর।

একদিন একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, কি কষ্ট হচ্ছে রে তোর, মুখখানা শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে?

আজকাল 'তুই তুই' করে আঁখির সঙ্গে কথা বলে ঋতুপর্ণা। পল্লবের সম্বোধনটা এখন আঁখিতে বর্তেছে।

কই কিছু না তো।

আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না, সত্যি করে বল?

আঁখির সত্যিটাকে অবলীলায় প্রকাশ করা এত সহজ নয়।

সে মাথা নিচু করে বসে রইল।

বুঝেছি, পল্লবের জন্য তোর মন কেমন করে।

কথাটা মিথ্যে না হলেও আঁখির ম্লান হয়ে যাবার কারণ এটা নয়। তার মুখ আরও নিচু হলো। দু'এক ফোঁটা জল পড়ল চোখ দিয়ে। এমন একটা মানুষ, যে দূরে থেকেও চিঠিতে ভরে দিচ্ছে ভালবাসা, তাকে একধরনের প্রতারণা করছে সে। কিন্তু তার মনের এই দ্বন্দ্বের কথা, যন্ত্রণার কথা বলবে কী করে! এ তো কাউকে বলার নয়, বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খাবে ঘুণ পোকা তবু প্রকাশ করতে পারবে না সে বুকের অকথিত যন্ত্রণা।

এতখানি হাসিখুশিতে ভরা অদ্রিবিজয়, তিনিও কেমন যেন মূক হয়ে গেছেন।

একদিন এক ডাক্তার বন্ধুকে বাড়িতে আনলেন তিনি। বেশ নামকরা গাইনোকলজিস্ট। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, সবকিছুই চলছে স্বাভাবিক নিয়মে।

তবে শরীর দিনে দিনে এত ম্লান হয়ে যাচ্ছে কেন?

ডাক্তার বোস বললেন, আমার অনুমান, মনের চাপ পড়ছে শরীরের ওপর।

সবার একই কথা, তবু মুখ খোলে না আঁখি। মনের অনেক গভীরে কোথায় যেন ধিক্ ধিক্ করে একটা আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের তাপে ধীরে ধীরে ঝলসে যাচ্ছে তার শরীর।

পল্লব দিদির চিঠিতে সবকিছুই জেনেছিল। সে আঁখিকে জানাল, তোমাকে এসময় সঙ্গ দেওয়া আমার প্রথম কাজ, বিশেষ করে আমাদের অনেক আদরের আগন্তুকটির কথা স্মরণ করে। আমি এখানকার পড়ায় ইতি টেনে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে ট্রাংককলে আঁখি পল্লবকে জানাল, আমি কথা দিচ্ছি আনন্দে থাকব। তুমি আমার জন্য পড়া ছেড়ে চলে এলে আমার চেয়ে দুঃখ কেউ পাবে না। আমি হয়তো তোমাকে পাব, কিন্তু আর কারু দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারব না।

এরপর সত্যিই নিজের সকল যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলল আঁখি। যে পাণ্ডুলিপির পাতা বন্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের মতো তাকে বার বার নাড়াচাড়া করে কি লাভ।

এতদিন পরে সবাই হাসি ফুটতে দেখল আঁখির মুখে। যে বিশালাকার মেঘটা চাঁদকে গ্রাস করেছিল, সেটা সরে গেল ধীরে ধীরে। এখন কোমল স্নিগ্ধ হাসিটি লেগে রইল আঁখির মুখে। সত্যি, যে কোনো ঘটনাকে ক্রমাগত গুরুত্ব দিয়ে গেলে সে মনের ওপর চেপে বসে পাষাণভারের মতো। সম্ভব মতো সমাধান করে তার ওপর থেকে মনটাকে সরিয়ে নাও, দেহমন একেবারে নির্ভার হয়ে যাবে। এটা একটা সাধনা, জীবনের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে এর সিদ্ধি।

যথাসময়ে শিশুমঙ্গল থেকে নবীন অতিথি এলো ঘরে। ঋতুপর্ণা তাকে বুকে করে আগলে ঘরে তুলল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারার ছেলে।

আঁখি খুবই খুশী। ফোনে পল্লব পেল পুত্রসন্তানের জন্মের শুভ সংবাদ। সে আঁখিকে লিখল, যদি দুরন্তগতির কোনো পাখির দুটো ডানা পেতাম, তাহলে এখান থেকে এখুনি উড়ে গিয়ে

সেই দেবশিশুটির গালে একটি উত্তপ্ত চুম্বন এঁকে দিতাম। যখন সে সুযোগ নেই তখন আশা করব ঘন ঘন তার একটি করে ফটো পাবার।

শেষে লিখেছে, এমন একটি সুন্দর শিশুর জন্ম দেবার জন্য গরবিনী জননীকে অজস্র ধন্যবাদ। ঐ নবজাতকের নাম 'সুফল' হলে কেমন হয়, ভেবে দেখতে পার। যার বাবা, পল্লব অর্থাৎ গাছের পাতা, তার পুত্র সেই গাছের ফল, যোগাযোগটা নিবিড় নয় কি? তাছাড়া সুফলের অর্থ কাম্য ফল। ও তো আমাদের কামনার ধন।

দাদার কাছে পুত্রদর্শনকাতর পিতার প্রস্তাবটি রাখবে। দিদিকেও জানাবে আমার ইচ্ছার কথা। সর্বোপরি তোমার কেমন লাগে তা কোনোরকম দ্বিধা না রেখে জানিও। আমার এ নামকরণকে ফাইনাল বলে ভেবে বস না।

সবারই ভাল লাগল নামটা। ও তো সকলেরই কাম্য ফল।

সত্যি, ছেলেটা যেমন হৃষ্টপুষ্ট তেমনি হাসিখুশি। সবাই আদরে আদরে ভরে দেয়।

ঋতুপর্ণা এই বালখিল্যের জন্য উল বুনতে শুরু করে দিয়েছে। বিশাখা দেবী পড়াশোনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তিনি ছিলেন বীরভূমের মেয়ে। চমৎকার কাঁথা তৈরি করতে পারতেন। তিনি নাতির জন্য একাধিক কাঁথা তৈরি করে ফেললেন।

অদ্রিবিজয়, দেড় বছর হতে না হতেই সুফলের হাত-পা নেড়ে-চেড়ে এক্সারসাইজ করানো শুরু করে দিলেন।

আঁখির যেন আর কিছু করার রইল না। হাসলে বাড়িসুদ্ধ লোক হেসে ওঠে, কাঁদলে সবাই বুকে চেপে ধরতে চায়।

সুফল যখন দেড় বছর তখন আঁখির নামে শিবন আঙ্কেলের একটি চিঠি এলো। কলামণ্ডপের পঁচিশ বৎসর পূর্তি-উৎসবের আমন্ত্রণ-পত্র। তার সঙ্গে একটুকরো চিঠি।

উৎসবের কার্ডখানা কতক্ষণ ধরে দেখল আঁখি। পাঁচ বছরের স্মৃতি, সে কি ভোলা যায়! ইংরাজী আমন্ত্রণ লিপি পড়ল ফিরে ফিরে।

এবার হাতে তুলে নিল ছোট চিঠিখানা। কেবলমাত্র দু'ছত্র

লেখা ঃ আজ সবচেয়ে অভাব বোধ করছি দুজনের। তুমি চলে গেছ তোমার নতুন জীবনে আর গতবছর ফেব্রুয়ারিতে সাহির আমাদের চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গেছে।

দোতলার ঘরে একা চিঠি পড়ছিল আঁখি। অদ্রিবিজয়ের তখনও ঘরে ফেরার সময় হয়নি। ঋতুপর্ণা স্কুল থেকে ফিরেছে কিছুক্ষণ। সে জলযোগ সেরে উঠোনের বাগানে নবীন অতিথির হাত ধরে ঘুরছে। টলোমলো পায়ে সুফল ছুটছে 'পু-মণি'র সঙ্গে।

চিঠিখানা খসে পড়ল আঁখির হাত থেকে। মাথাটা ঘুরে গেল তার। সে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়।

কতক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে এলো আঁখির। সে বিছানায় উঠে বসল। ঘরে আবছা অন্ধকার। বাইরে আলো জ্বলে গেছে। নিচের ঘরে ছড়া শোনাচ্ছে ঋতুপর্ণা আর কলরব তুলছে সুফল।

গতবছর ফেব্রুয়ারিতেই তো জন্মেছে তার ছেলে। অদ্ভুত যোগাযোগ।

আঁখির আবার মনে হলো, এ ছেলে কার! সে যা একেবারেই ভুলে যেতে চেয়েছিল তাই আবার জেগে উঠল তার মনে।

সে যেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে সাহিরকে ক্রাচে ভর দিয়ে। তার গায়ে হেলান দিয়ে মায়ের দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সুফল।

কি অদ্ভুত মিল বাচ্চাটার সঙ্গে সাহিরের। চোখের তারার রঙ দুজনেরই হালকা ব্রাউন। মাথার চুল কোঁকড়া।

ভীষণ একটা যন্ত্রণার ঢেউ উঠে আসছে তার বুকে ঠেলে। যদি সাহিরের সন্তান হয় ও তাহলে মাইওপ্যাথিতে আক্রান্ত হতে পারে। হা ঈশ্বর, এই সম্ভাবনার হাত থেকে তুমি বাঁচাও আমার নিষ্পাপ শিশুটিকে। আমার কৃতকর্মের জন্য যত খুশি আমাকে শাস্তি দাও প্রভু।

সে এবার মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল মারাত্মক ভাবনাগুলো। তার মনে পড়ল, এ রোগের উৎস পিতৃকুল নয়।

ঐ তো তার সুফলের গলার স্বর ভেসে আসছে। ভোরের রোদে শিউলি কুড়োনোর মতো এ পৃথিবীর কতকগুলো ভাষা সে কুড়িয়ে নিচ্ছে। কিছু পড়ে যাচ্ছে, আবার কুড়োচ্ছে।

কচি ফলের মতো গাছের ডালকে শক্ত করে ধরে আছে সে। চারদিক ঘিরে শ্যামল শোভা। অফুরন্ত প্রাণের রসে পূর্ণ হচ্ছে প্রতিদিন। হে প্রভু, তোমার এই পবিত্র সুন্দর বাগানে হঠাৎ যেন দুরন্ত ঝড় বয়ে না আসে। যেন গুপ্ত কোনো ঘাতক তার এই পবিত্র নবীন দেহের মধ্যে ঢুকে না পড়ে।

আঁখি দরজা ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে বেরিয়ে গেল নিচে। আশ্চর্য! কচিকাঁচাদের পায়ের ছেঁড়া ঘুঙুরগুলো মেরামতি করছে পিসি, আর তাকে ঘিরে আবর্তন করতে করতে নিজস্ব দেবভাষায় অনর্গল কিছু উচ্চারণ করে চলেছে শিশু। ভালবাসার উত্তাপ ছেড়ে কোথাও যাবে না সে। আঁখি তাকে জোর করে বুকে তুলে নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। বিপুল কান্নায় সে ফিরিয়ে দিল তার মাকে।

ঋতুপর্ণা বলল, ও আপন মনে বেশ তো খেলছে, একটু পরেই ওর মায়ের কথা মনে পড়বে, তখন আপনিই ছুটবে।

রাতে ছোট্ট একটুকরো স্বপ্ন দেখল আঁখি। সমুদ্রের ধারে বসে বেহালা বাজাচ্ছে সাহির। অপূর্ব সুর ইন্দ্রজালের মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সুরের যাদুতে সম্মোহিত চরাচর। আকাশের পূর্ণচন্দ্র থেকে সুধা ঝরছে সমুদ্রে। সেই রজতকিরণ খেলা করছে ঢেউয়ের শীর্ষে। সমুদ্রের ওপর যেন তৈরি হচ্ছে একটা জ্যোতির পথ।

আঁখি দেখল, সেই আলোর পথে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে একটি শিশু। কি অপূর্ব সে! হঠাৎ একটা ঢেউ তাকে আড়াল করে ফেলতেই চিৎকার করে উঠল আঁখি। ঘুম ভেঙে গেল তার। পাশে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা শিশুটিকে উদ্বেগে বুকে টেনে নিল সে।

অদ্রিবিজয় ভোরবেলা শিশুটিকে নিয়ে উঠোনে ফুলে ভরা রক্ত-করবী গাছটির পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সূর্যের আলোটি ওখানেই প্রথমে এসে পড়ে। অদ্রিবিজয় সূর্যের সেই সোনালী জলে স্নান করান সুফলকে। এই শিশুটির জন্য অসীম মমতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর প্রাণ। আজকাল বন্ধুটির বাড়ি যাওয়া প্রায়ই ছেড়ে দিয়েছেন। কেবল রোববার বিকেলে নিয়ম করে যান, খেলাধুলো গল্পগুজবের শেষে রাত করে বাড়ি ফেরেন।

অফিস ছুটি হওয়া মাত্রই অদ্রিবিজয় চলে আসেন ঘরে। দরজা থেকেই হাঁক পাড়েন, সু-ফ-ল···।

শিশুটি দু'বছর পূর্ণ করেছে। সে এখন দিব্যি চেনে অদ্রিবিজয়ের গলা। 'পু-মণি'—'পু-মণি' ডাক পাড়তে পাড়তে ঋতুপর্ণার আঁচল ধরে টেনে নিয়ে যায় দরজার পাশে।

অদ্রিবিজয় বেল না বাজিয়ে বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে সুফলের নাম ধরে ডাকেন প্রতিদিন। এটা শিশুটির সঙ্গে তাঁর নিত্যদিনের আনন্দের খেলা।

দরজা খোলামাত্রই অদ্রিবিজয় মুঠিভরা হাত তুলে ধরেন। হাতে প্রতিদিন একটি করে ফল থাকে।

বল কি এনেছি?

এখন শিশুটি শিখে গেছে নাম। বলে, ফল।

এবার বল, কি ফল?

শিশু কিছু একটা ভেবে নিয়ে বলে, আপেল।

হলো না, হলো না, বল কি ফল?

এবার শিশু অধৈর্য, বলে, দাও-দাও।

তুমি এবার খুব ভেবে বল, কি ফল, তাহলে ঠিক দিয়ে দেব। বল, বল কি ফল?

কলা।

সাবাস, পেরেছে পেরেছে বলে কোলে তুলে নেন সুফলকে। হাতে ধরিয়ে দেন সোনা রঙের পাকা কলাটি।

এবার আসার সময় হয়ে গেছে পল্লবের। কেরালায় থাকতে আঁখি শিবন আঙ্কেলের কাছে ফটো তোলার পাঠ নিয়েছিল। তিন চার বছরের ভেতর তার তোলা ফটোর একটা এগজিবিশন হয়েছিল। ব্যবস্থা করেছিলেন শিবন। কায়েলের জলে বোটরেস, কলাকলি নৃত্য, সমুদ্রের মৎস্যজীবী, শস্যকর্তনরত কিষাণী, নারিকেল বৃক্ষে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো অর্ধনগ্ন সহাস্য রমণী। এমনি প্রায় পঞ্চাশখানা ছবিতে তুলে ধরা হয়েছিল কেরালার জনজীবন।

বহু গুণীজনের প্রশংসা লাভ করেছিল সে। ফটো তোলার শখ ছিল আঁখির বাবার। একখানা 'রোলি কর্ড' আর 'মিনলটা'

ছিল তাঁর সংগ্রহে। আঁখি সে দুটি পেয়েছিল উত্তরাধিকারসূত্রে। শিবন আঙ্কেলের কাছে ছবি তোলা শিখছে জেনেই বিশাখা দেবী ক্যামেরা দুটো মেয়েকে দিয়ে এসেছিলেন। তারই ফল, ঐসব ছবির সিরিজ।

নিজের ছেলের ছবি নিজেই তুলেছে আঁখি। শিশুর সহস্র লীলার ছবি। এসব ছবির কপি পাঠান হয়েছে পল্লবের কাছে। প্রায় চার বছর ধরে সংখ্যাতীত ছবির মিছিল।

ওদেশে পল্লবের বন্ধুরা নাকি উচ্ছ্বসিত হয়েছে সুফলের ছবি দেখে। তারা আঁখির তারিফ করেছে শতমুখে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা অসাধারণ সব ছবি।

অক্টোবরের আকাশ নীলকান্ত মণির মতো উজ্জ্বল। তিন মাসের অশ্রান্ত বর্ষণে প্রকৃতি তার স্নানলীলা সেরে সবুজ স্নিগ্ধ শোভা ধারণ করেছে। ভরা-নদীতীরের কাশগুচ্ছ কাঁপিয়ে ভেসে আসছে একটা বাদ্যধ্বনি।

ছড়ার দেশের ঢাকিরা বুঝি মহানন্দে ঢাক বাজাতে শুরু করেছে খালবিল জুড়ে।

চারদিকে শিউলি ফুলে পুজোর আঘ্রাণ।

পাঁচটি বছর পূর্ণ করে স্বজনের কাছে ফিরে এলো একান্ত প্রিয় মানুষটি। ডাক্তার পল্লব দত্ত চৌধুরী এখন নামকরা অর্থো-পেডিক সার্জেন। সঙ্গে সঙ্গে মেডিসিনের ওপরেও হায়ার স্টাডি করে এসেছে।

এয়ারপোর্টে বিশাখাদেবী ছাড়া সকলেই পল্লবকে রিসিভ করার জন্য উপস্থিত। পরমাত্মীয়টির জন্য অদ্রিবিজয় বছরখানিক আগে একটি মারুতি কিনেছেন। সাদা মারুতিটি অতি সাবধানে নিজেই ড্রাইভ করেন। তাই একেবারে নতুনের মতো রয়েছে গাড়িটা। সেটিতে আজ নিয়ে যাবেন একান্ত প্রিয়জনটিকে।

ঋতুপর্ণা চেয়েছিল আঁখির পাশটিতে থাকবে সুফল, তার হাতে থাকবে আধফোটা কুঁড়িসহ পাঁচটি গোলাপের একটি বোকে। সে তার বাবার হাতে সেটি তুলে দেবে।

সব পরিকল্পনাটাই ঠিক রইল, কেবল একটি পরিবর্তন আঁখির জেদে। সুফল থাকবে তার 'পদ্ম-মণি'র হাত ধরে।

এনক্লোজারের বাইরে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। প্লেন ল্যান্ড করেছে কয়েক মিনিট আগে। এবার একে একে মালপত্র ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে আসছে প্যাসেঞ্জাররা।

একসময় দেখা গেল পল্লব আসছে। চেহারা দেখে যেন চেনাই যায় না।

এমনিতে পল্লব লম্বা গড়নের স্বাস্থ্যবান ছেলে। কিন্তু ফিরে এলো আরও ফর্সা, উজ্জ্বল আর সুগঠিত দেহ নিয়ে।

ঐ রেলিং-এর ওপার থেকেই বাবার হাতে ফুল দিল সুফল। কোলে নিতে না পারলেও পল্লব স্পর্শ করল তার ছেলেকে। একমুখ হাসি কিন্তু আনন্দের অশ্রু চিক্‌চিক্‌ করে উঠল চোখে।

এবার দুটো গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সবাই।

বাইরে এসেই ছেলেকে কোলে তুলে নিল পল্লব। ভারী মিশুকে ছেলে হয়েছে সুফল। তার আপন পর নেই, যে ভালবেসে কাছে টানে তারই কাছে যায়।

অদ্রি ড্রাইভ করছে। প্ল্যানমাফিক তার পাশে বসেছে ঋতুপর্ণা। পেছনে পল্লব আর আঁখি। পল্লবের কোলে বসেছে সুফল। বাঁহাতে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে আছে সে। ডান হাতখানা বেঁধে রেখেছে আঁখির বাঁ হাতের সঙ্গে। দুজনে পথের আলোর মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে দুজনকে। নির্বাক কিন্তু উত্তাপে ভরা দুটি প্রাণ।

খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-কলরব আর গল্পগুজবে অনেক রাত হলো।

সাধারণত রাতে ঋতুপর্ণার কণ্ঠলগ্ন হয়ে শোয় সুফল। আজ মা-বাবার সংলগ্ন খাটে শুয়েছে সে। অনেকক্ষণ ঘুমন্ত ছেলেকে আদর করেছে পল্লব। সুফল ঘুমুলেই কাদা।

এখন আঁখি আর পল্লব মুখোমুখি। পাঁচ বছরের সঞ্চিত বিরহ বেদনা অবসানের মুহূর্তে আসন্ন। সবার দৃষ্টির সামনে পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ কোনো কথা বলার সুযোগ পায়নি তারা। এখন চারদিক নিভৃত নির্জন। মাঝরাত্ত বহুক্ষণ পার হয়ে গেছে। দেয়াল ঘড়ি জানান দিয়ে যাচ্ছে সময়।

দুজনে উন্মুখ, দুজনের বুকের ধ্বনি শোনার জন্য।

প্রথম কথা পল্লবের, গোলাপের বোকেতে পাঁচটা ফুল ছিল,

তাই না ?

ওটা দাদার প্ল্যান। উনিই বোকেটা তৈরি করিয়ে এনেছিলেন।

দারুণ প্ল্যান জামাইবাবুর। পাঁচটা গোলাপের বাঁধনে এ বাড়ির পাঁচজন আমরা বাঁধা পড়েছি।

শুধু কি তাই ?

তবে ?

আঁখি মনে করিয়ে দিল, তুমি এলে ক'বছর পরে ?

ঠিক তো, পাঁচ বছর।

সুফলের বয়স কত ?

সেও তো পাঁচ বছরে পড়ল তাই না ?

আঁখি বলল, ছেলেটা কার ?

পল্লব মজা করে বলল, সে তুমিই ভাল জান।

এই চারটি শব্দ যেন ভোমরার মতো আঁখির কানে, মাথায় বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

সে কতক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। তার মনে হলো, কে যেন তার একান্ত সুরক্ষিত গোপন কুঠরির তালা খোলার চেষ্টা করছে।

সে 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে পারল না। পাছে পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে তার গুপ্তধনের খবর পৌঁছে যায়। এদিকে চোরের কাছেও এগোতে পারল না সাহস ভরে।

কি গো, চুপ করে গেলে কেন ? রাগ করলে ?

না না, রাগ করব কেন ? তুমি খুব ক্লান্ত রয়েছ, তোমার ঘুমের দরকার।

এতদিন পরে বাড়ি ফিরলাম, তোমাদের সবাইকে দেখছি, বিশেষ করে সুফলকে, তাই নার্ভ সেন্টারগুলো উত্তেজিত হয়ে আছে। ঘুম কিছুতেই আসছে না। তুমি বরং ঘুমোও।

আঁখি বলল, কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে নিশি জ্যগরণ করতে হয়, আজ আমাদের চোখে সেই রাতের ছোঁয়া লেগেছে।

পল্লব আঁখিকে নিবিড় করে বুকের কাছে টেনে নিল। চুম্বনে, আলিঙ্গনে, বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে, প্রেমিকার দীর্ঘদিনের রুদ্ধ কান্নায়, প্রেমিকের উত্তপ্ত সোহাগে জ্যোৎস্নাধোয়া রাত্রি কেঁপে কেঁপে উঠতে

লাগল।

শেষরাতে সহবাসে তৃপ্ত রমণী সহসা তার একান্ত পুরুষটিকে বলল, ছেলে কার, একথা আমিই জানি,—এমন একটা সন্দেহের ইঙ্গিত তুমি দিলে কেন?

এখনও কথাটা তোমার মাথায় ঘুরছে, আশ্চর্য! ওটা নিছক একটা কৌতুক।

আঁখি বলল, ঐ ধরনের কথা কেউ বললে আমি কেমন অস্থির হয়ে পড়ি।

এবার পল্লব বলল, কথাটা কিন্তু একেবারেই সত্য। নারী যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহলে সে-ই কেবল জানতে পারে সন্তানটি কার?

কিন্তু এমন পরিস্থিতিও তো আসতে পারে যখন অল্প ব্যবধানে সে দুটি পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সন্তান ধারণ করে সে বুঝতেই পারবে না সন্তানটি কার?

সেটা ঠিক, তবে তারও সঠিক পরীক্ষা আছে বিজ্ঞানে।

কি রকম?

সন্তান এবং তার সামাজিকভাবে স্বীকৃত জন্মদাতা ডি. এন. এ. টেস্ট করলে সন্তান তার পিতার ঔরসজাত কিনা তা ধরা পড়বে।

আঁখি বলল, যে কোনো মানুষের সন্দেহ হলেই তো সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ টেস্টটা করিয়ে নিতে পারে।

পল্লব জানাল, কেবল হায়দ্রাবাদেই এখন ঐ টেস্টটা হচ্ছে।

একটু থেমে বলল, তুমি যে দেখছি পুরোপুরি ডাক্তারের বউ হয়ে গেলে। এই সব গূঢ় ডাক্তারি প্রশ্ন ভেসে উঠছে তোমার মনে। বিদেশে যাবার আগেও তুমি আমার কাছে মাইওপ্যাথি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলে। শুভলক্ষণ। কোনোদিন আমার কাজে সাহায্যের দরকার হলে তোমাকে পাশে পাব, এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো।

হঠাৎ একটা ঝড় উঠল আঁখির মনে। সে কি প্রতারণা করছে না তার স্বামীকে! প্রায় পাঁচ বছর ধরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার সন্তানটিকে নিয়ে। কে তার সত্যকারের পিতা, সাহির না পল্লব?

এই মুহূর্তে তার মনে হলো, সারা জীবন অন্ধকারের ভেতরে একটা সত্য ঢাকা থাকবে তা হতে পারে না। তাছাড়া এ জীবনে

যাকে নিয়ে সংসার করতে হবে তার কাছে সব সত্য আলোর মতো পরিষ্কার করে দিতে না পারলে কোনোদিনই সে নিজের মনে শান্তি খুঁজে পাবে না। এ জন্যে ক্ষুব্ধ পল্লব যদি তাকে চরমতম শাস্তি দেয়, যদি তাকে পরিত্যাগও করে তাহলেও সে তা মেনে নেবে মাথা পেতে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি যন্ত্রণার ভেতরেও তার একটা সান্ত্বনা থাকবে, সে নির্মম একটা সত্যকে মিথ্যার আবরণে কোনোভাবেই গোপন রাখেনি।

এমন চুপ করে থেকে কি ভাবছ আঁখি?

আচ্ছা, একান্ত নির্জনে কোথাও কটা দিন কাটিয়ে এলে কেমন হয়? এই মারুতিখানা নিয়ে। তুমি কি…।

কথা শেষ করতে না দিয়েই পল্লব বলল, গাড়ি চালাতে পারি কিনা জানতে চাইছ? নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে তুমি আমার পাশে বসে থাকতে পার। হাইওয়েতে আশি থেকে নব্বই মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্য রাস্তার অবস্থা আশানুরূপ হলে।

আসলে আমি তোমাকে দু'চারটে দিন একান্তে কাছে পেতে চাই।

কোথায় যাবে বল?

এই বিহারের দিকে কোথাও গেলে হয়।

দূরে না কাছে?

আমি শুনেছি, নেতারহাট ছবির মতো জায়গা।

বেশ তো চল, ওখানেই থেকে আসি।

পল্লব ব্রেকফাস্টের টেবিলেই কথাটা তুলল।

অদ্রিবিজয় বললেন, দারুণ প্ল্যান, ঘুরে এসো।

আঁখি অমনি বলল, তোমরা যাবে না দাদা?

এবারটি আমাকে ছেড়ে দাও দিদি। তোমার দিদিটি যায় কিনা দেখ।

ঋতুপর্ণা বলল, তোরা ঘুরে আয় আঁখি, যাওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আবার গাড়ি নিয়ে সবাই হুট করে কোথাও বেরিয়ে পড়ব। আমরা তখন একটা বড় গাড়ি যোগাড় করে মাসিমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব।

অতএব আঁখি, পল্লব সুফলকে নিয়ে যাত্রা করল নেতারহাটের দিকে।

বন, পাহাড়, নদী, সমতলের বিচিত্র ছকে বাঁধা অনন্য বিহার। বহু প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সমৃদ্ধ সব জনপদ। ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের রাজধানী। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন নালন্দা। সর্বোপরি বিশ্ববিশ্রুত ধর্মাচার্য ভগবান বুদ্ধের সাধন-পীঠ।

পল্লব বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল। সে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের নিবিষ্ট পাঠক।

সে গাড়ি চালাতে চালাতে পাশে বসে থাকা আঁখির সঙ্গে প্রাচীন বিহারের সমৃদ্ধি নিয়ে গল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

দু'দিকে লক করা পেছনের সিটে একাই রাজত্ব করছে সুফল। মাঝে মাঝে নামানো গ্লাসের বাইরে সদ্য পাওয়া খেলনার রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ে পথের ধারে গাছের ওপর বসে থাকা পাখিদের সন্ত্রস্ত করছে। এক একবার মা-বাবার মাঝখানে মুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে আদর খাচ্ছে।

বাবাকে তার ভীষণ পছন্দ। নতুন মানুষ, কোথা থেকে উদয় হয়েছে এতগুলো রকমারি খেলনা নিয়ে। বাঁশিটা তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। সে আপন মনে সেটা বাজায়, শোনে আর মুগ্ধ হয়।

তাই নতুন মানুষটির গলা জড়িয়ে ধরে সে তার কচি নরম গাল বাবার গালের ওপর চেপে ধরছে।

আঁখি অভিমানের গলায় বলছে, হ্যাঁ রে দুষ্টু, মাকে ভুলে গেলি! সকাল থেকে একটিবারও গলা জড়িয়ে আদর করনি মাকে।

অমনি মায়ের মুখখানা জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বনে ভরে দিচ্ছে সে।

যাত্রাপথে নাইট হল্ট করতে করতে তৃতীয় দিনে ওরা রাঁচি ছেড়ে বেরিয়ে গেল নেতারহাটের পথে।

মাঝে মাঝে কেমন যেন আত্মমগ্ন হয়ে বসে থাকছে আঁখি, আবার পল্লবের সঙ্গে মগ্ন হচ্ছে গল্পে।

বিদেশে উইক এন্ডে বন্ধুরা গাড়িতে করে কেমন বান্ধবীদের নিয়ে সমুদ্রতীরে অথবা পিকনিক স্পটে উড়ে চলে যায় তার সরস

গল্প করে চলেছে পল্লব।

পথে পড়ল কোয়েল। বড়বড় বোল্ডারে পাক দিতে দিতে কলধ্বনি তুলে ছুটে চলে যাচ্ছে নদী। সূর্য মাথার ওপর। অক্টোবরেও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে শরীর।

নদীর ধারে গাড়ি থামাল পল্লব।

আমি নদীতে একটু চান করে নেব।

আঁখি ভয়ের গলায় বলল, কিন্তু স্রোত এখানে ভীষণ। নামামাত্রেই স্রোত বোল্ডারের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

তোমরা আঙুল জলে ডুবিয়ে মুখে-মাথায় ছিটোও, আমি ততক্ষণে নদীর সঙ্গে একটু কোলাকুলি করে নি। ভয় কী।

পোশাক ছেড়ে অন্তর্বাসের ওপর তোয়ালেখানা জড়িয়ে নিল পল্লব। স্রোতের গতির সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিল সে। মুহূর্তে পৌঁছে গেল চার-পাঁচখানা বোল্ডারের পাশে। স্রোত ওদের ভেতর দিয়ে ভারী সুন্দর এঁকেবেঁকে চলেছে।

একখানা মসৃণ ছোট বোল্ডারের ওপর উঠে বসল সে। জলে পা ছোঁয়ালেই ফোয়ারার মতো জল ছড়িয়ে পড়ছিল।

সুফল বায়না ধরল, আমি তোমার কাছে যাব বাবা।

আমি না গেলে তুমি আসবে কী করে বাবা! আমি আগে যাই তোমার কাছে, তারপর দেখ কেমন স্নান করাই।

অনেক দূর থেকে ছোট-বড় বোল্ডার ছড়ানো আছে। কোনোটা জলের তলায় মাথা ডুবিয়েছে। স্রোতের বেগ একটু কমলেই মাথা তুলছে জলের ওপর।

ঐ বোল্ডারগুলোর ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে অনেকখানি ওপরের দিকে উঠে গেল পল্লব। তারপর স্রোতে ভাসিয়ে দিল শরীর। একসময় জল কেটে কেটে তীরে উঠল সে।

পাঁচ বছর শীতের দেশে কাটিয়ে এসে শীতবোধ অনেকটাই কমে গেছে পল্লবের।

তুমি আর গায়ে হাওয়া লাগিও না, তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নাও।

চিন্তার কিছু নেই আঁখি, বাইরের দেশে থেকে আমার ঠাণ্ডা সয়ে গেছে। সুফলকে একটা কিছু জড়িয়ে আমার কাছে দাও, ও

খুব এনজয় করবে।

আঁখি ভয় পেয়ে চোখ কপালে তুলে বলল, ওকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নাকি!

দেখই না কি করি, ছেলেটা মনে হচ্ছে শুধু তোমার-ই।

মুখে কৌতুকের হাসি পল্লবের।

আঁখি সুফলকে শুধুমাত্র একটুকরো তোয়ালে জড়িয়ে ঠেলে দিল পল্লবের দিকে।

তীরে বসে পল্লব ছেলের হাত ধরে রইল। ওকে কিন্তু নামিয়ে দিল জলে।

খরস্রোতে ভেসে আছে সুফল। স্রোত চাইছে নিয়ে যেতে, পল্লব তাকে টানছে নিজের দিকে। একটা অদ্ভুত অনুভূতির শিহরণ জাগছে সুফলের শরীরে।

হঠাৎ দারুণ খুশীতে সে একটা শব্দ করে উঠল।

একটু দূরে বসে কতকগুলো চিন্তার জট পাকিয়ে তুলছিল আঁখি। তার মনে হচ্ছিল, ঐ বোল্ডারের ওপর আর পল্লব বসে নেই। ওখানে বেহালা কাঁধে তুলে বসে রয়েছে সাহির। সে এতক্ষণ স্রোতের ধ্বনির সঙ্গে সুর মেলাচ্ছিল। হঠাৎ সে যেন বেহালা থামিয়ে চিৎকার করে উঠল, সুফল, তুমি চলে এসো আমার কাছে। আমি তোমাকে নদীর গান শোনাব।

না···, আরও তীক্ষ্ণ একটা শব্দ আঁখি ছুঁড়ে দিল বাতাসে।

চমকে উঠল পল্লব, সে জল থেকে তুলে নিল সুফলকে।

পল্লব ছেলের হাত ধরে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, কি হলো, তুমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে যে?

চোখের ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি। সে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, ও কিছু নয়।

এখন গাড়ি ছুটে চলেছে একটা পাহাড় লক্ষ্য করে। কালো রঙের পাহাড়, মাঝখানটা লাল দগদগ করছে। মহিষাসুরের কাটা রক্তাক্ত গলদেশের মতো।

পাহাড়ে উঠে গেল গাড়ি। একসময় ঘুরে ঘুরে পল্লবের সাদা মারুতিখানা পেঁৗছে গেল নেতারহাটে।

পুজো আগতপ্রায়, আকাশে-বাতাসে আমন্ত্রণ। নীল খামের

ভেতর সোনালী অক্ষরে লেখা চিঠি দিকে দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক শুকপাখি। বটের ডালে সারি দিয়ে বসে থাকলে মনে হয় সবুজ পাতায় ছেয়ে গেছে ডাল। বটের টুকটুকে লাল ফল যেন ওদের ঠোঁটের রঙবাহার।

চিঁড়িপাখিগুলো পিকির পিকির আওয়াজ তুলে হাওয়ার স্রোতে ভেসে গিয়ে পড়ছে ফসলের ক্ষেতে। পশু মানুষ সকলের কাছে পাহাড়ী প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে তার সম্পদ।

এক একটি সংসার রচনা করে পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে দাঁড়িয়ে আছে শালের গাছ। বসন্ত-মঞ্জরীর মুকুট পরে যখন দাঁড়ায় তখন অন্য মহিমা। সে ঋতু এখনও আসেনি।

পি. ডব্লিউ. ডি. বাংলোর একখানা রুম মিলে গেল ভাগ্যক্রমে। বাকি রুমটি ঐ বিভাগের অফিসারদের জন্য প্রায়ই রিজার্ভ থাকে।

চৌকিদারটি বৃদ্ধ না হলেও বয়স্ক মানুষ। এক একটি মুখ আছে যা দেখলে মনে হয়, তার অধিকারী চির আনন্দময়। ভাগ্যক্রমে রামনিবাস সেরকম একটি মুখের অধিকারী। যে কোনো একটি কাজের আদেশের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রামনিবাস, তারপর আদেশ পাওয়ামাত্র সে সেটি সম্পন্ন করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

রামনিবাসকে সব থেকে ভাল লেগে গেছে সুফলের। সে রামনিবাস ভাইয়ার হাত ধরে ওপরে চাটের দোকান থেকে সিঙাড়া নিয়ে আসছে। আবার শালগাছের জটলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ভালুক সেজে দাঁড়াচ্ছে রামনিবাস, তাকে লক্ষ্য করে দূর থেকে হাঁটু মুড়ে বসে গুলি ছুঁড়ছে শিকারী সুফল।

বিকেলে চায়ের জন্য দুধ আনতে বেরিয়ে গেল দুজনে। এখন রামনিবাসের হাতে ঘটি, কাঁধে সুফল।

ওরা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ী ওম্ পথ ধরে। ধাপে ধাপে পাহাড় গিয়ে কিছুদূরে একটা বনের সৃষ্টি করেছে। শাল-গাছের সঙ্গে জংলা কিছু গাছের জটলা। তার কোলে ঘাসে ভরা সবুজ একটি লন। বন থেকে একটি ঝর্ণা বেরিয়ে লনের একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে অনেক নিচের উপত্যকায় প্রপাতের মতো নেমে গেছে।

ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে, ওরা দ্বটিতে লনে গিয়ে দাঁড়াল।

রামনিবাস মুখের দু'দিকে হাতের পাতা চেপে ধরে জোরে শব্দ তুলে কাকে যেন ডাকল।

সামান্য সময় পরেই বন চিরে বেরিয়ে এলো একটা গাই। হৃষ্টপুষ্ট গরুটির পেছন পেছন এসে দাঁড়াল একটি রাখাল বালক।

রামনিবাস হাতের পাত্রটি তার দিকে এগিয়ে ধরতেই সে সেটি নিয়ে দুধ দুইতে লেগে গেল।

দুধভরা ঘটিটি রামনিবাসের হাতে তুলে দিয়েই ছেলেটি গরু নিয়ে ঢুকে গেল বনের ভেতর।

তৃতীয় দিনে পল্লব আর আঁখি নেমে গিয়ে বসল বনের ধারে ঝর্নাতলার নির্জনে। সেখানে ছোট্ট একটি অভিজ্ঞতা হলো তাদের।

কোথায় যেন পুজোর ঘণ্টা বাজছে। সারা বন কাঁপিয়ে অনেক-গুলো ঘণ্টা বেজে চলেছে। কিছু পরে কমে গেল সে ধ্বনি।

বেশ খানিক পরে মনে হলো, কাছে-পিঠে কোথায় যেন একটি-মাত্র ঘণ্টা বাজছে। কে যেন বনের ভেতর থেকে কাকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছে ওদের ঐ একটুকরো ঘাসে ভরা জমির দিকে।

প্রথমে গরুটা বন থেকে বেরিয়ে এসে পল্লবদের দেখে থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ওর গলায় বাঁধা ঘণ্টাটা টং টং করে বেজে উঠে থেমে গেল।

গরুটার পেছনে ত্রস্তে এসে দাঁড়াল একটি রাখাল ছেলে। তার হাতে ঘাসের একটা আঁটি।

সেই ঘাস খেতে লাগল গরুটা অমনি তার গলায় দড়ি পরিয়ে দিল সেই রাখাল ছেলেটি।

পল্লব ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল, ঐ আহির সম্প্রদায়ের ছেলেরা বনে প্রতিদিন গরু চরাতে আসে। গরুর গলায় বাঁধা থাকে ঘণ্টা। ওরা নড়লেই ঘণ্টায় টুংটাং আওয়াজ ওঠে।

পাল থেকে ছিট্‌কে পড়ে কোনো গরু যদি অন্য কোনোদিকে চলে যায় তাহলে তার গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দই বলে দেবে সে এখন কোথায়।

রাখাল ছেলেটি তার হারানো গরুটিকে ঝর্ণায় জল খাইয়ে বনের ভেতর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

ওরা এখন চেয়ে আছে নিচের উপত্যকার দিকে। সূর্য তার সোনালী উত্তরীয়টি তুলে নিচ্ছে উপত্যকার ওপর থেকে। হরিৎ শস্যক্ষেত্রের কত বিচিত্র রঙবাহার। উপত্যকার বুক চিরে গেরুয়া রঙের কোয়েল নদী ছুটে চলে গেছে দিগন্তে। সেখানে নীলাভ পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে আছে কুয়াশার হালকা মসলিন।

এই অপার্থিব দৃশ্য শুধু উপভোগ করছে পল্লব। আঁখি এক-দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে আছে, কিন্তু তার মন ঘুরছে নিজের একান্ত গোপন গভীরে। প্রকৃতির দিগন্ত ব্যাপ্ত এই আনন্দমেলাতেও নিরন্তর তার কানে এসে বাজছে এক বিষাদ রাগিণী।

ফিরে আসার আগের দিন একটু বেলা থাকতেই ওরা নেমে গেল নিচের ঝর্ণাতলায়। আজ ওরা শুনতে পেল না গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি।

পল্লব অনুমান করল, আজ হয়তো আহির-পল্লীতে গৃহপালিত পশুদের নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান আছে। অথবা এ বনে ঘাসের অভাব হওয়ায় অন্য কোনো ঘাসের জমির সন্ধানে চলে গেছে।

আঁখি বলল, বনের মধ্যে বড়সড়ো কোনো পাখি চিৎকার করছে বলে মনে হয়। চল না, বনের ভেতর একটু ঢুকি।

পল্লব বলল, চল।

ওরা বনে ঢুকল। বন গভীর নয়। বড়ছোট নানারকমের ঝোপ-ঝাড় গাছগাছালিতে ভরা। এ বনে আলোর আলপনা আঁকার সুযোগ আছে। তাই এখানে-ওখানে নানা রঙের ফুল দেখা যাচ্ছে। শীতের শুরুতেই যদি এই ফুল দেখা যায়, না জানি বসন্তে কত ফুল ফুটবে!

একটা পায়ে চলা সিঁথিপথও ওরা পেয়ে গেল। রাখাল ছেলে-দের পায়ে পায়ে তৈরি পথ।

খানিকটা এগিয়েই গাছের ফাঁকে দেখা গেল, বনের মাঝে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সবুজ ঘাসের জমিতে মনে হলো কেউ একজন বসে আছে।

ওরা জঙ্গল চিরে বেরিয়ে এলো ফাঁকা জমিনটার ধারে।

একটু দূরে একটি মেয়ে ঘাসের জমিতে বসে কিছু একটা করছে বলে মনে হলো।

ওরা এগিয়ে গেল। ওদের দিকে পেছন করে বসেছিল মেয়েটি।

ডানদিকে একরাশ রঙিন পালক ছড়িয়ে পড়ে আছে, বাঁয়ে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে আস্ত একটা বনমোরগ। সে খানিকটা ঝটপট করছে কিন্তু মোক্ষম বাঁধন, পালাবার পথ নেই। পাশে গোটানো রয়েছে নাইলনের সম্ভবত পাখি ধরার জাল।

একেবারে কাছে এসে পড়ায় মেয়েটি ওদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল।

ছিপছিপে গড়ন, খোঁপা উঁচু করে বাঁধা, তাতে দুটো লাল আর নীল রঙের পালক গোঁজা। শবর জাতির মেয়ে বলেই মনে হলো।

সে একটা মুর্গীর পালক তুলে চামড়া ছাড়িয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে ড্রেস করছিল।

আঁখি বলল, পাখি দুটো কি তোমার জালে ধরা পড়েছে ?

হাঁ মেমসাব।

তুমি এখানে কি প্রায় জাল পেতে পাখি ধর ?

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। অভিযোগের সুরে বলল, এ বনে আমাদের জেতের লোকেরাই পাখি ধরত। ক'বছর হলো আহিররা গরু নিয়ে ঢুকে পড়েছে। আজ ওদের পার্বণ, তাই ভোররাত থিকে জাল পেতেছিলাম। তিনটে পাখি নেমেছিল খাবার খেতে। ছড়ানো দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। আমি বনের ভিতর থেকে দেখছিলাম। মাদী পাখিটা বেশ হুঁশিয়ার ছিল। হঠাৎ কি নিয়ে যেন বিবাদ বাধল দুটো মদ্দার। ঝটাপটি করতে করতে জালে এসে পড়ল আর জড়িয়ে গেল। মাদী পাখিটা উড়ে পালাল। ঐ যে দূরে পিপুল গাছটা দেখছেন, ওটাতেই পাখিটা বসে আছে।

মেয়েটি কথা বলতে ভালবাসে।

পল্লব এবার কথা বলল, তুমি দেখছি একটা পাখির মাংস কেটেকুটে তৈরি করছ, আর একটা জ্যান্ত পড়ে আছে, ব্যাপার কি ?

ফরেস্টের সাহিবের আজ আসার কথা আছে। আমার মরদকে চৌকিদার বলে রেখেছিল, সাহিবকে সে বনমুর্গার মাংস খাবাবে। বরাত ভাল, পেয়ে গেল। একটা পাখির মাংস চারজন দিব্যি

খাবে। আর একটা জিন্দা আছে, তুমি লিবে নাকি বাবু ?

আঁখি অমনি বলল, আমাকে দাও।

পল্লব বিস্মিত, কি করবে তুমি এত বড় পাখি নিয়ে ? কাল ভোরেই তো চলে যাচ্ছি।

তবু আঁখি জেদ ধরে বলল, আমি যদি পাখিটা নিই, তুমি কি আমার ওপর খুব রাগ করবে ?

একথা কেন বলছ, তোমার ইচ্ছে হলে অবশ্যই নেবে। হাঁ গো, কত দাম নেবে মুর্গারি ?

মেয়েটি বলল, দু'কিলোর বেশি মাংস হবে, বিশঠো রুপিয়া দিবেন।

পল্লব অবাক হয়ে বলল, এখন তো মাংসের অনেক দাম, তুমি বিশ বলছ কেন, আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না, ঠিক ঠিক দাম বল।

আমি দাম জানি সাহেব। আপনার মেমসাবকে দেখে আমার বহুৎ আচ্ছা লেগেছে। ও আমার বহিন আছে, পাখিটা এমনি দিয়ে দিলাম।

আঁখি বলল, বেশ আমি বহিনের দেওয়া পাখিটা নিলাম, কিন্তু আমি বহিনের বালবাচ্চাদের মিঠাই খাওয়াবার জন্য রুপিয়া দেব, তুমি না বলতে পারবে না।

ও একমুখ হেসে হাত পাতল।

আঁখি তার ব্যাগ খুলে একশো টাকার একটা নোট বের করে মেয়েটির হাতে দিল।

চোখ বড় বড় করে মেয়েটি বলল, অ্যাতো !

আঁখি বলল, আর কোনো কথা নয়। তুমি পাখিটা বের কর।

মেয়েটি খুব সাবধানে মোরগটাকে বের করল।

কি নাম তোমার ?

কোয়েলা।

বাঃ এ তো পাখির নাম। ভারী মিষ্টি।

এবার পা-বাঁধা মোরগটাকে ঝুলিয়ে লিয়ে যাও।

আঁখি বলল, আমি যা বলি শোন। তুমি ওটার পায়ের বাঁধন খোল।

তাই করল মেয়েটি। এখন পাখিটা ছটফট করছে তার হাতের ভেতর।

এবার উড়িয়ে দাও পাখিটাকে, ঐ পিপুল গাছের দিকে, যেখানে মেয়ে মুর্গীটা বসে আছে।

পল্লব অবাক হয়ে গেছে, সে কোনো কথা বলতে পারছে না। আঁখি এতখানি সেন্টিমেন্টাল, সে ভাবতেই পারেনি।

কম হতচকিত হয়নি ঐ শবরী মেয়েটা। সে এক কাণ্ড করল, পাখিটার একদিকের ডানার দুটো পালক খসিয়ে নিল।

ওটা কি করলে?

এরপর জালে পড়লে ওটাকে চেনার উপায় করে রাখলাম। তখন উড়ায়ে দিতে হবে তো।

বলতে বলতেই পাখিটাকে দু'হাতে তুলে ধরে পিপুল গাছের দিকে ছুটে গেল শবরী। তারপর ছেড়ে দিল শূন্যে।

মুখ নিচু করে মোরগটার অবিশ্বাস্য মুক্তি দেখতে লাগল মুর্গীটা।

রাতে সুফলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওরা এসে বসল বারান্দায়। চাঁদের রাত, কিন্তু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে।

ওরা একটা সোফায় পাশাপাশি হাতে হাত জড়িয়ে বসল।

আঁখি বেশ শান্ত অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, অনেক দিন থেকে আমি তোমাকে একটা কথা বলব বলে ভাবছি কিন্তু বলে উঠতে পারিনি, আজ আমার মন সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে উঠেছে। আমি আমার জীবনের সেই একান্ত কথাগুলো এই মুহূর্তে তোমার কাছে বলে মনের ভার দূর করতে চাই। নিজেকে আমার প্রতিদিনই মনে হয়েছে প্রতারক। আমার সব থেকে যে প্রিয়, দিনের পর দিন তার কাছে সবকিছু গোপন রেখে তাকেই ঠকিয়ে চলেছি। বিশ্বাস কর, তোমাকে বলতে না পেরে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি যেন স্বাভাবিক নিঃশ্বাসটুকুও নিতে পারছি না। তুমি আমাকে চরম শাস্তি দিলে হয়তো আমি একটুখানি সান্ত্বনা খুঁজে পাব।

নিভৃতে মনের বন্ধ দরজাটি সহসা খুলে দিয়ে দু'হাতের পাতায় চোখমুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল আঁখি।

বিহ্বল পল্লব আঁখিকে দু'হাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার বুকের মধ্যে রয়েছ আঁখি, তোমার কিসের ভয়, কিসের দুঃখ। মনে কোনো দ্বিধা না রেখে তুমি তোমার সব কথা আমার

কাছে উজাড় করে দাও।

চোখ মুছে নিজের আবেগকে শান্ত করে আঁখি অকপটে বলে গেল তার জীবনের কথা।

পাঁচ বছর সে কলামণ্ডপে কিভাবে সাধনায় মগ্ন ছিল, বন্ধুদের সঙ্গে তার কত আনন্দঘন মুহূর্ত কেটেছে তারই স্মৃতি-মধুর বিবরণগুলি একে একে সাজিয়ে দিল আঁখি।

সেই কলামণ্ডপেই বেহালাবাদক সাহিরের সঙ্গে তার পরিচয়। সবাই বলত সাহিরের বেহালায় যাদু আছে।

তার হাসিমুখ, সুগঠিত দেহ আর বেহালাটি নিয়ে সে যখন মঞ্চে হাজির থাকত, তখন সকলেই দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠত। বাইরের প্রোগ্রামে মঞ্চে ওঠার আগে ও-ই সকলকে যোগাতো উৎসাহ। ওর প্রাণঢালা প্রেরণাতেই উজ্জীবিত হয়ে উঠত সমস্ত দলটা।

কেবল বেহালা নয়, যে কোনো যন্ত্রী গরহাজির থাকলে তার কাজটা ও চালিয়ে নিতে পারত। তিথি, এডাক্কি, মুখবীণা, টপ্পু মাদ্দলম্, যেটাতেই সে হাত দিত, সেটাই যেন প্রাণ পেয়ে কথা বলে উঠত।

শিবন আঙ্কেলের ডান হাত ছিল সাহির। এককথায় ঐ সুদর্শন গুণী যুবকটি ছিল কলামণ্ডপে সকলের কাছে এক বিরাটপ্রেরণা।

সে কিন্তু ক্রাচে ভর দিয়ে চলত। ঈশ্বরের আদালতে সে ছিল এক মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী।

তার এই অনিবার্য পরিণতির কথা জেনেও সে কিভাবে যে এতখানি আনন্দে লিপ্ত থাকতে পারত তা ভেবে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

তার ঐ মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার কথা আমি শুনেছি তারই মুখ থেকে, যখন আমি দেশে ফিরে আসছিলাম। কায়েলের জল কেটে ওরই ভাল্লমে চেপে আমি এর্নাকুলমে ট্রেন ধরব বলে এগোচ্ছিলাম। ওই চালাচ্ছিল ওর চুরুলন ভাল্লমখানা। বাসে উঠিনি, কেবল জল-যাত্রাটা উপভোগ করব বলে। তিন-চার দিন ধরে এই নৌযাত্রার প্ল্যানটা আমিই দিয়েছিলাম।

সেই প্ল্যান অনুযায়ী বিশ্রাম করতে করতে এগোচ্ছিলাম আমরা। স্বপ্নের মতো কাটছিল আমাদের দিন-রাতগুলো। এত নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে করতে দুজন পূর্ণ বয়সের যুবক

যুবতী যে পথ চলতে পারে তা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না।

মৃত্যু আসন্ন জেনে কি সে দেহকে এমন নিষ্কাম আর মনকে এমন পবিত্র রাখতে পেরেছিল!

আমরা চাঁদের জ্যোৎস্নাধোয়া নারকেল বীথির পাশ দিয়ে গান গাইতে গাইতে নৌকা চালিয়ে গেছি। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙেছি, হাততালি দিয়ে আকাশে উড়িয়েছি সাগর পাখিদের। আমি মনের খুশীতে নেচেছি, ও বেহালা বাজিয়ে মাৎ করে দিয়েছে চরাচর।

আমি রাতে বিশ্রাম নিতাম পালকির মতো একটি কেবিনের ভেতর। সাহির শুয়ে থাকত নোঙর করা নৌকার খোলে।

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বন্ধু হিসেবে একদিন নিছক কৌতূহলে ও এতদিন কেন বিয়ে করেনি তা জানতে চেয়েছিলাম। ও অসংকোচে জানিয়েছিল ওর বেদনার কথাগুলো। আর সেদিনই ওর বিয়ে না করার কারণ হিসেবে জানতে পারি, ওর ঐ মারাত্মক রোগের কথা।

কি রোগ? এতক্ষণ পরে কৌতূহল প্রকাশ করল পল্লব।

তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে সম্ভবত ওকে মাইওপ্যাথি বলে।

হ্যাঁ, রোগটার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত জড়িয়ে আছে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। তুমিও তো আমাকে আমেরিকা যাবার আগে এ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছিলে।

করেছিলাম। তার একটা উদ্দেশ্যও ছিল, সেটা তুমি কিছু পরেই জানতে পারবে। এখন শোন, সাহির আর আমার শেষ সাক্ষাৎকারটা।

আমি যখন জানলাম, একটি যুবক শুধু তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে বিয়ে করতে পারছে না, তখন সেই ভাগ্যহত বিবেকবান যুবকটির ওপর আমি প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম।

দেহের উদগ্র কামনা থেকে এ আকর্ষণ জন্মায়নি, কেবল এক মৃত্যুপথযাত্রীকে বিবাহিত জীবনের ক্ষণিক স্বাদ দেবার জন্য আমি সাহিরকে একটি রাতের মত স্বামীর মর্যাদা দিলাম।

সাহির প্রবলভাবে আমার প্রস্তাবকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, তাতে বেড়ে গিয়েছিল আমার জেদ। আর তারই পরিণতিতে একরাত্রি সাহিরের সঙ্গে আমার সহবাস ঘটে।

সাহির আমাকে একটি শর্ত দিয়েছিল, আমি যেন ঐ একরাতের স্মৃতিটুকু জীবন থেকে মুছে ফেলি।

পল্লব জানতে চাইল, ওর স্মৃতি কি তুমি ভুলতে পেরেছ ?

পারিনি, আর এই না পারার একটা কারণও আছে।

কি কারণ ?

সুফল।

সুফল ! কেন ?

পিরিয়ডের ভেতরেই দুজনের সঙ্গে আমার সহবাস হয়েছে, তাই বুঝতে পারছি না সুফলের বাবা কে।

আমার কাছে পাঁচ বছর আগে এমনি একটা প্রশ্ন তুমি রেখেছিলে। আমি বলেছিলাম, পিতা ও সন্তানের ডি· এন· এ টেস্ট করলে সঠিক সবকিছু জানা যাবে।

আঁখি বলল, হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে। কিন্তু তখন সাহস করে কোনো কথা তোমাকে বলতে পারিনি। তাছাড়া তুমি তখন বাইরে যাবার জন্য তৈরি, আমি সে সময় কোনোভাবেই তোমাকে ডিসটার্ব করতে পারতাম না।

পল্লব বলল, এখন তুমি কি চাও ?

আমি রাত্রিদিন মনের এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই। কখনো কখনো সাহিরকে আমি দেখতে পাই, সে যেন সুফলের দিকে চেয়ে আছে। কেরালার চিঠি থেকে জানা গেছে, সাহির আর বেঁচে নেই। তবু আমি ওকে দেখি। এই তো আসার দিন, কোয়েলের জলে তুমি যখন সুফলকে স্নান করাচ্ছিলে তখন আমি দেখলাম, সাহির বোল্ডারের ওপরে বসে সুফলকে বেহালা শোনাবে বলে ডাকছে।

ওটা তোমার মনের বিকার। দীর্ঘদিন মনের ভেতর ভাবনাগুলোকে নিয়ে জট পাকিয়েছ, তাই এ সব অবাস্তব জিনিস বাস্তব বলে ভ্রম হচ্ছে।

আমি কি কোনোভাবেই এর থেকে মুক্তি পাব না ?

সুফল কার ছেলে সেটা যদি তুমি জানতে পার তাহলে কি করবে ? যদি ডি· এন· এ টেস্টে প্রমাণিত হয়, ও সাহিরের সন্তান, তাহলে তুমি কি করবে ?

তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পার ব্যভিচার করার অপরাধে,

তাহলে আমি সুফলকে নিয়ে মায়ের কাছে চলে যাব, অথবা হতভাগ্য ছেলেটা থাকবে কোনো ডেস্টিটিউট হোমে।

আর যদি সন্তান আমার বলে প্রমাণিত হয় ?

সেখানে তুমি সন্তানকে রেখে আমাকে পরিত্যাগ করতে পার। আমি কোনো কিছু গোপন না রেখেই তোমাকে সব কথা বললাম, বিচারের ভার তোমার।

স্থির হয়ে কিছুক্ষণ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে বসে রইল পল্লব। চাঁদ মেঘের ভেতর ঢাকা পড়েছে। চাঁদের আলোয় ভাসা উপত্যকা এখন অস্পষ্ট আর ম্লান। থমথম করছে প্রকৃতি, একটা ঝড়ের আভাস।

পল্লব কথা বলল, যতক্ষণ না আমার আর সুফলের ডি. এন. এ টেস্ট হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সবার সামনে স্বাভাবিক আচরণ করে যেতে হবে। আমার দিদি-জামাইবাবু কিংবা তোমার মা যেন আমাদের আলোচনার বিষয়ে কিছু জানতে না পারেন।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল পল্লব।

ঝড় উঠেছে, এখন ভেতরে যেতে হবে, কাল ভোরবেলা রওনা।

পল্লব ঢুকল। ইতিমধ্যে ঝরা পাতার একটা ঝাপ্টা এসে আছড়ে পড়ল বারান্দায়। আঁখি ঘরের ভেতর ঢুকে প্রায় অন্ধকারে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাঝে সুফল, দুজন দু'দিকে, বাইরে অবিরাম ঝড়। দুজনের কারু চোখে ঘুম নেই। ভাবনার গভীরে তলিয়ে গেছে দুজনে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে দুটি মন।

আঁখি ভাবছে, তার একরাত্রির হঠকারিতার আজ এই পরিণতি। সব কথা শোনার পর পল্লব কোনোদিনই আর তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। সে সবকিছুই গোপন করে যেতে পারত কিন্তু সুফলের সত্যিকারের পিতা কে তা তার আজ জানা দরকার। এ প্রশ্নে সন্তানকে সে প্রতারণা করতে পারবে না। সে যদি সাহিরের সন্তান হয় তাহলে তাকে নিয়েই সে সরে যাবে। অবশ্য সে যদি সঠিক জানতে পারত ছেলে পল্লবের তাহলে সাহির প্রসঙ্গটি টেনে আনার আর দরকার হতো না। কিন্তু এখন সুফলের প্রয়োজনে পথ যত দুর্যোগে ভরাই হোক্, সত্যকে সেই পথে আহ্বান করে আনতেই হবে।

মনের যন্ত্রণাগুলোকে মুক্তি দিতে পেরে সে এখন অনেক হালকা বোধ করছে, পরিণতি যাই হোক না কেন। সে মনে মনে কিছুদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিল পল্লবকে সবকিছু জানাবার জন্য। সন্দেহ নেই সে ব্যাধের মতো তীর ছুঁড়ছে আনন্দলীলায় মত্ত সম্পূর্ণ শঙ্কাহীন পাখিটির দিকে। এখন হতচকিত আহত পাখিটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

পল্লবের সত্যিই দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। যে নারীকে সে তার জীবনের সব থেকে বড় প্রাপ্তি বলে মনে করেছিল, যার নৃত্য-সুষমায় সে আবিষ্ট হয়েছিল, যার প্রতিদিনের হাসি আর দৃষ্টিপাত শ্রেষ্ঠ কোনো শিল্পীর সার্থক শিল্পকর্ম বলে মনে হয়েছিল, সে এই মুহূর্তে তার চোখে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে গেল—এই অপ্রত্যাশিত আঘাত সে সইবে কি করে।

বিদেশে এমন রাত্রি যায়নি, যে রাতে তার পাশে পল্লব অনুভব করেনি এই নারীর জীবন্ত অস্তিত্ব। উইক এন্ডে হুল্লোড় করে জীবনটাকে উপভোগ করার জন্য কত বিদেশিনী তার সঙ্গ চেয়েছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে আঁখির নির্মল সুন্দর মুখখানা। সে সাড়া দেয়নি তাদের ডাকে, সরে এসেছে নানা অজুহাতে।

আজ তার স্বপ্নের নারী ভেঙে চুরমার করে দিল তার সাধের প্রাসাদ।

তবু উত্তেজিত হবে না সে, প্রতীক্ষা করবে সেই লীলাকারের যিনি সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

ঝড়বৃষ্টির শব্দ সারা বাংলোটাকে যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বেশ কড়া ঠাণ্ডা বন্ধ দরজা-জানালার ফাঁকে ঢুকে পড়েছে। সুফল ঘুমের ঘোরেই উত্তাপের খোঁজে জড়িয়ে ধরেছে পল্লবের গলা।

ছেলেটাকে সত্যি গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে পল্লব। বুকের ভেতর সে টেনে নিল শীতে কাতর সুফলকে।

শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই ঘুম ভাঙল সূর্যোদয়ের পর।

কখন বাইরে উঠে গেছে আঁখি। ঝড় থেমে গিয়ে প্রসন্ন আকাশ।

রোদের সোনা এসে স্পর্শ করেছে সুফলের ঘুমন্ত মুখ। পল্লব সেই অপাপবিদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পার-

ছিল না।

অর্থোপেডিক সার্জেনদের একটা কনফারেন্স হচ্ছিল ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে যোগ দিতে চলে গল পল্লব। ফিরবে হায়দ্রাবাদ হয়ে, সেখানে কিছু জরুরী কাজ আছে তার।

বাড়ির সবাই এটুকু জানলেও হায়দ্রাবাদ যাত্রার কারণটুকু জানতে অসুবিধে হয়নি আঁখির। ডাইনিং টেবিলে বসে তার যাত্রার কথা ঘোষণা করেছিল পল্লব, আলাদা করে আঁখিকে সে কোনোকথাই বলেনি। যাবার আগে সুফলের কাছ থেকে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সংগ্রহ করে নিয়েছিল। সেটা লক্ষ্য করেছিল আঁখি। কাঁপছিল তার সারাটা দেহমন। কিন্তু যত নির্মমই হোক এর পরিণতি, তাকে তা মেনে নিতে হবে মাথা নিচু করে। কারণ সে নিজেই চেয়েছে সত্যকে অন্ধকার থেকে টেনে বের করতে।

কনফারেন্স শেষ করে হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে এল পল্লব। গাড়ি অনেক রাতে ইন করল। তাই বাড়ি পেঁাছতে দেরি হয়ে গেল তার। এস. টি. ডি. করে ফেরার ডেটটা জানিয়ে দিয়েছিল ও।

রাত হলেও সবাই ওর জন্য খাবার টেবিলে অপেক্ষা করছিল। সুফল সন্ধ্যা থেকেই 'বাবা আসছে, বাবা আসছে' বলে মাতামাতি করছিল, কিন্তু যথাকালে সবার চাপাচাপিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

খাবার টেবিলে প্রথম থেকেই সার্ভ করার দায়িত্ব ঋতুপর্ণার। সে-ই বাবার জন্য সুফলের জেগে বসে থাকার খবর দিল। তারপর অনেক ধস্তাধস্তি করে ছেলেটাকে যে ঘুম পাড়ানো হয়েছে, তাও জানাতে ভুলল না।

অদ্রি বললেন, অনেক রাত হয়েছে, লম্বা ট্রেনজার্নির পর ওর এখন বিশ্রামের দরকার। চটপট ডিনার সেরে ওকে এখন শয়নমন্দিরে পাঠাও। কাল ব্রেকফাস্টের টেবিলে ও মুখ খুলবে।

খাওয়া শেষ হলে অদ্রিবিজয় নিজেই ঠেলে শ্যালককে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন।

খাবার টেবিলে সারাক্ষণ একজন কিন্তু নীরবে খেয়ে যাচ্ছিল, সে আঁখি। তার চোখেমুখে স্বামীর ফিরে আসার জন্য বাড়তি কোনো খুশীর উদ্ভাস ছিল না। পল্লব লক্ষ্য করেছিল, আঁখির মুখখানা কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ওপরে পল্লব উঠে যাবার কিছুপরে ঋতুপর্ণা আঁখিকে বলল, তোকে আর এখানে কাপপ্লেট নাড়াচাড়া করতে হবে না, তুই ওপরে যা, পল্লবের কিছু দরকার হতে পারে।

আঁখি পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠল ওপরে। দরজা আধ ভেজানো অবস্থায় রয়েছে। ঘরে ঢুকতে পা কাঁপছিল, বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করছিল তার। সে দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ ফেলল ভেতরে। সবুজ বেড ল্যাম্পটা শেডের ভেতর থেকে চক্রাকার একটা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানার ওপর।

দরজার দিকে পেছন ফিরে আধশোয়া অবস্থায় লেপ খানিকটা সরিয়ে দিয়ে ঘুমন্ত ছেলেকে আদর করছে পল্লব। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আছে, কিন্তু ছেলেটা তার কচি দুখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে।

অতি সন্তর্পণে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল আঁখি। প্রায় নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে পিঠ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

এ কী শেষ বিদায়ের আদর না অন্য কিছু। পা কাঁপছে, বিচারকের রায় শোনার আগেই যেন সম্বিত হারাবে অপরাধী।

হঠাৎ পেছন ফিরে আঁখিকে দেখতে পেল পল্লব। সঙ্গে সঙ্গে সুফলকে বিছানা থেকে টেনে তুলে নিয়ে বলল, নাও, ছেলেকে আদর কর, ও আমাদেরই সন্তান।

পাগলের মতো ছুটে এসে আঁখি বুকে জড়িয়ে ধরল সুফলকে, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ভেঙে পড়ল কান্নায়।

মা ও ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বুকের উত্তাপে ভরে দিয়ে পল্লব বলল, তুমি অকপটে সত্যকে প্রকাশ করেছ, তাই ঈশ্বর তোমার স্বামী ও সন্তানকে একই বাঁধনে বেঁধে দিলেন।

তখনও থামেনি আঁখির কান্নার উচ্ছ্বাস, সে পল্লবের বুকে ঝরাতে লাগল তপ্ত অশ্রু। মাঝে মাঝে উন্মাদের মতো সোহাগে চুম্বনে অস্থির করে তুলল ঘুমন্ত সন্তানকে।

সুফলের জন্মরহস্যের নির্মম সত্যটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার আবরণে ঢেকে দেওয়ামাত্র যে মধুর এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো, তা দেখে নিজেই অভিভূত হয়ে গেল পল্লব।

●